দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

কাশ্মীরে 'বিশেষ সুবিধা আইন' বাতিলই ভারতকে এনে দেবে পূর্ণ স্বাধীনতা—পৃঃ ২৪

ভারতীয় সংবিধানে অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত — পৃঃ ১৫

৭১ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ১৫ জুলাই ২০১৯।। ২৯ আষাঢ় - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

৩৭০ ধারাই জম্মু-কাশ্মীরে অশান্তির মূল

ধারা ৩৭০

ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা কাশ্মীরকে সাময়িক কিছু বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত রাজ্যের মান্যতা দেয়। সংবিধনের ঊনবিংশ অধ্যায়ে 'সাময়িক, পরিবর্তনযোগ্য এবং বিশেষ সুবিধা' নামক একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে, যেখানে ৩৭০ ধারার বর্ণনা পাওয়া যায়।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ৩৭০ ধারা অবশ্যই একটি সাময়িক ব্যবস্থা। যতক্ষণ না সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাটিকে স্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয় ততক্ষণ এটি সাময়িকই থাকবে। এখনও পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন করে সেরকম কিছু করা হয়নি। সুতরাং ৩৭০ ধারায় বর্ণিত কাশ্মীরের স্পেশাল স্টেটাস তকমা এখনও সাময়িক।

— সুভাষ কাশ্যপ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ

কাশ্মীরকে দেওয়া বিশেষ সুবিধার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে না।

—জওহরলাল নেহরু

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২৯ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১৫ জুলাই - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সেনমশায়ের ভক্তরা ভারী অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন ▯ বিশ্বমিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : এন আর সি ও নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের উদ্যোগ ইতিবাচক ▯ নিধুভূষণ দাস ▯ ৭

ভারতের জলসম্পদকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করবে দেশের ভবিষ্যৎ ▯ অমিতাভ কান্ত ▯ ৮

শক্তিশালী ভারত গঠনে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্গঠন দরকার ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১১

কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ অমিত শাহের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ ▯ সনাতন রায় ▯ ১৩

ভারতীয় সংবিধানে অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ▯ অশোক কুমার চক্রবর্তী ▯ ১৫

সাম্প্রতিককালে সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা ▯ পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু ▯ ১৭

৩৭০ ধারা বিলোপের পক্ষে অমিত শাহের বক্তব্য কুর্নিশযোগ্য ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৩

কাশ্মীরের ‘বিশেষ সুবিধা আইন’ বাতিলই ভারতকে এনে দেবে পূর্ণ স্বাধীনতা ▯ সুজিত রায় ▯ ২৪

কাশ্মীরকে বিশেষ সুবিধা যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতির বিরোধী ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ২৬

গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক দেদীপ্যমান উৎসব শ্রীগুরুপূর্ণিমা ▯ বিনয়ভূষণ দাস ▯ ৩১

গল্প : বাগানবাড়ি ▯ পিন্টু ভট্টাচার্য ▯ ৩৫

বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে হিন্দুবিদ্বেষী ▯ মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৪১

ময়দান ফিরে পাক হারানো গরিমা ▯ অনামিকা দত্ত ▯ ৪২

শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলা এবং বিদ্যমান ভারতের পরিস্থিতি ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জি ▯ ৪৩

সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং এর প্রকৃত সাংবিধানিক মর্যাদা ▯ বিমল শঙ্কর নন্দ ▯ ৪৪

দেশ ও জাতির জন্য চাই যুব সমাজ ▯ চন্দন রায় ▯ ৪৫

তৃণমূল নেত্রীর বাম-কংগ্রেস প্রশস্তি ▯ ধীরেন দেবনাথ ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে
২২ জুলাই
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যা

বাঙ্গলায় শ্রীরাম

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, বাঙ্গলায় শ্রীরামের কোনো অস্তিত্ব নেই। এখানকার প্রধান দেবী মা দুর্গা। শ্রী সেন সম্ভবত ভুলে গেছেন বাঙ্গালি যে দুর্গাপুজো করে তার আরেক নাম অকাল বোধন। যার সূচনা করেছিলেন স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র। তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, কবি তুলসীদাস রামচরিতমানস লেখার বহু আগে বাঙ্গালি কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাঙ্গলায় রামায়ণ লিখেছিলেন। সুতরাং বাঙ্গলায় শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— বাঙ্গলায় শ্রীরামের অস্তিত্ব এবং গণভিত্তি। লিখবেন ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

প্রকাশিত হবে
২২ জুলাই
২০১৯

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank - Kolkata

Branch : **Shakespeare Sarani**

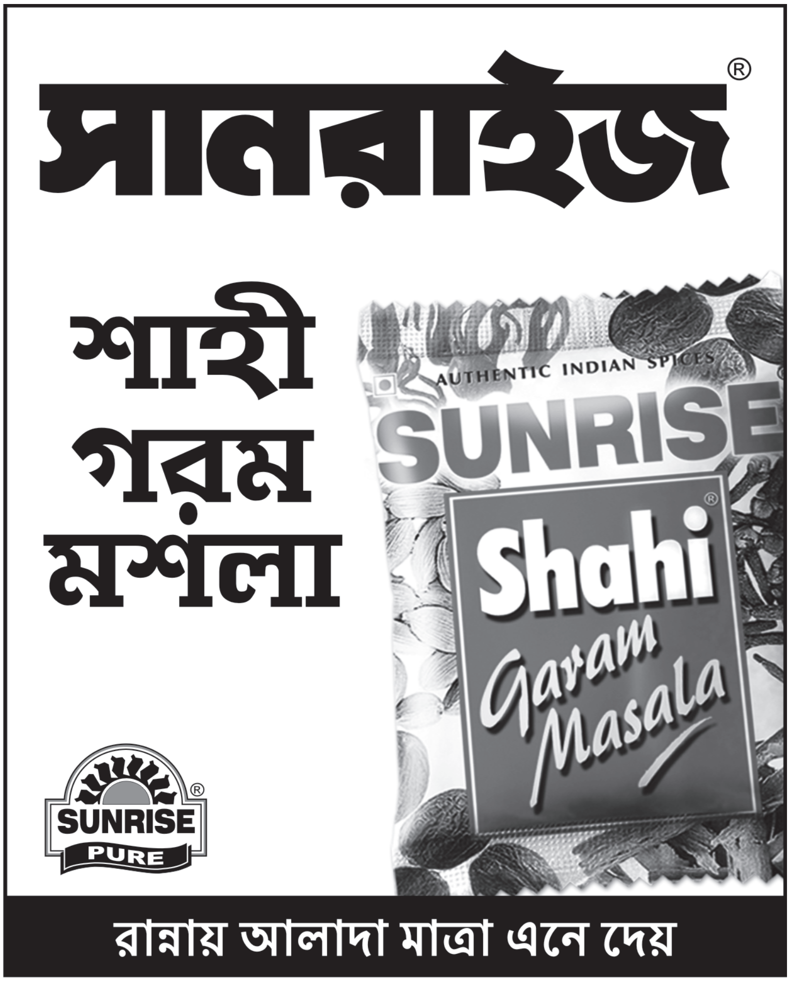

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিলুপ্ত হউক ৩৭০ ধারা

ভারতীয় জনতা পার্টি দীর্ঘদিন ধরিয়া দাবি করিয়া আসিতেছে, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করিতে হইবে। ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই কথা বলা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করিবার পর অমিত শাহও এই একই কথা বলিয়াছেন। এই স্থানে একটি বিষয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের এই ৩৭০ ধারাটি কখনই চিরস্থায়ী কোনো বন্দোবস্ত নয়। বরং, সংবিধানের একুশতম অংশে সবিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই ধারাটি সাময়িক, পরিবর্তনশীল এবং অস্থায়ী। সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকরও বলিয়াছিলেন, ৩৭০ ধারা একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহারও বিলুপ্তি প্রয়োজন। সমস্যা হইল, স্বাধীনতার পর সত্তর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তবু কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করিবার কথা কেহই ভাবেন নাই। এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্টত এই ধারাটি বিলোপের কথা বলিলেন। সংবিধানে ৩৭০ ধারা সংযোজনের বিষয়ে খোদ বাবাসাহেব আম্বেদকরেরই প্রবল আপত্তি ছিল। সংবিধানে এই ধারাটি সংযোজিত হয় মূলত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আগ্রহে। কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহর পরামর্শেই এহেন কর্মটি করেন নেহরু। এই ৩৭০ ধারার ভিতর যে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, কালে কালে ইহা যে জাতীয় ঐক্যের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে— সেই বিপদসঙ্কেত ধরিতে পারিয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রথমাবধি তিনি এই ধারাটির বিরোধিতা করেন। শ্যামাপ্রসাদ আওয়াজ তুলিয়াছিলেন, এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান। শ্যামাপ্রসাদ প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, ভারতীয় সংবিধানকে মান্যতা দিয়াই কাশ্মীর ভারতের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। তাহা হইলে কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র সাংবিধানিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে শেখ আবদুল্লাহ ব্যাকুল কেন? এই ৩৭০ ধারার বিরোধিতা করিতে গিয়াই শ্রীনগরে শেখ আবদুল্লাহর কারাগারে অকালে মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল শ্যামাপ্রসাদকে।

বস্তুত ৩৭০ ধারা যেইদিন হইতে বলবৎ হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের সূত্রপাত। দীর্ঘ সাত দশক ধরিয়া এই ধারাটি কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহী করিয়াছে। তাহাদের হাত শক্ত করিয়াছে। এই ধারাটির কারণে সাংবিধানিকভাবে ভারতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ জম্মু-কাশ্মীরে কায়েম না হইবার ফলে, পাকিস্তানি জঙ্গি-জেহাদি গোষ্ঠীগুলি ওই রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতীয় মূল স্রোত হইতেও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহারা। হুরিয়ত কনফারেন্সের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি তাই ৩৭০ ধারা বহাল রাখিবার পক্ষে সওয়াল করিতেছে। ৩৭০ ধারার পক্ষে সওয়াল করিতেছে কংগ্রেস এবং বামপন্থীরাও। কারণ, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি এই দুই দলেরও নরম মনোভাব বারংবারই প্রকাশ্যে আসিয়াছে। কিন্তু দেশের অখণ্ডতা এবং ঐক্যের স্বার্থে, কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং উগ্রপন্থা প্রতিরোধের লক্ষ্যেই এই অপ্রয়োজনীয় ধারাটি অবিলম্বে বিলোপ সাধন প্রয়োজন। দীর্ঘ সাত দশক ধরিয়া এই প্রয়োজনীয় কাজটি না হওয়ার কারণে ভারতকে অনেক মাশুল গুনিতে হইয়াছে। ফলে, আর বিলম্ব না করিয়া বর্তমান সরকার যত শীঘ্র সম্ভব এই ধারাটির বিলোপ করিলে, তাহা শুধু কাশ্মীরের পক্ষে নয়, দেশ ও জাতির পক্ষেও মঙ্গলদায়ক হইবে।

সুভাষিতম্

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ রাজন্ স্বর্গস্যোপরি তিষ্ঠতঃ।

প্রভুশ্চ ক্ষময়া যুক্তো দরিদ্রশ্চ প্রদানবান্।। (বিদুর নীতি)

শক্তিশালী হয়েও যিনি ক্ষমা করতে জানেন এবং নির্ধন হয়েও যিনি দান করতে পারেন— এই দুই প্রকার পুরুষ স্বর্গেরও উপরে স্থান গ্রহণ করেন।

সেনমশায়ের ভক্তেরা ভারী অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন

সেদিন জ্ঞানদার সঙ্গে বাজারে দেখা। বর্ষার বাজারে জিনিসপত্রের দাম ঊর্ধ্বমুখী, জ্ঞানদাকে একটু বাজিয়ে দেখব ভাবছিলাম। আসলে জ্ঞানদা ওনার প্রকৃত নাম নয়। তাঁর আসল নাম যে কী, তাই সবাই ভুলে গেছে। পথে ঘাটে, ট্রামে-বাসে, রকে আড্ডায় স্বল্পকেশ, বছর পঞ্চাশের জ্ঞানদা আসলে অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। সিঙ্গাপুর ভ্রমণ থেকে সিঙ্গাপুরী কলা, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফুটবল থেকে ন্যাশনাল ইউনিটি সবকিছুই জ্ঞানদার একেবারে যাকে বলে নখদর্পণে। তা সেদিন রবিবার সকালের বাজারে জ্ঞানদাকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। গলাটা একটু কেশে সাফ করে জিজ্ঞেস করলুম— কী জ্ঞানদা বাজারদর কী বুঝছো? এখানে বলে রাখি, গত পাঁচ বছরে এই ধরনের অর্থনীতি ঘেঁষা প্রশ্নে জ্ঞানদার উত্তর বেশ পাল্টে যাচ্ছিল।

বছর পাঁচেক আগে হলে সেনমশায়ের অর্থনীতির প্রবল ভক্ত জ্ঞানদা ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স, সোশ্যাল চয়েস থিয়োরি এসব বোঝাতো।

একবার তো সোশ্যাল চয়েস থিয়োরি অনুযায়ী আমায় উচ্ছে না খেয়ে করলা খেতে বলেছিল। দোষের মধ্যে আমার পদবি কর, আর আমি কী একটা বিষয়ে টাটা, বিড়লাদের সমর্থন করেছিলাম, তাতে জ্ঞানদা বলেছিল তুই বড়োলোকদের চামচা, তোর পদবী কর, টাটা বিড়লাদের সঙ্গে একাসনে বসে তুই করলা হয়ে গেছিস। সোশ্যাল চয়েস অনুযায়ী কমিউনিস্ট ক্ষুদ্রাকৃতি উচ্ছেকে বাদ দিয়ে তুই পুঁজিপতি করলাই খাবি। তো এহেন জ্ঞানদা গত পাঁচ-ছ' বছরে অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রশ্ন এলেই গোরুর রচনায় চলে যাচ্ছিল। যেমন একদিন জিগ্যেস করলুম আচ্ছা জ্ঞানদা শুনছি একটা সংবাদপত্রে নাকি নিরন্তর লোক ছাঁটাই চলছে, সহ-সম্পাদক থেকে রক্ষী পর্যন্ত?

বাজার করতে এসে আনন্দে তিনি বলে ফেললেন তা হবে না, নোটবন্দিতে কেমন জব্দ হয়েছে— পরক্ষণেই সামনে নিয়ে বললে মোদী সরকার অর্থনীতি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থ, এর জন্য দায়ী গেরুয়াপন্থীদের অসহিষ্ণুতা, অশিক্ষিতামো ইত্যাদি। মানে সমস্ত অর্থনৈতিক 'থিয়োরি' শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে অসহিষ্ণুতা, গৈরিকীকরণ, 'অশিক্ষিত'-এর বেশি আর এগোচ্ছিল না।

সেনমশাই যখন বলল--- বিজেপি হারলে খুব খুশি হবো, কিন্তু ওরাই জিতবে

বিশ্বামিত্র-র

কলম

ভেবে দুঃখ হয়। আমি ভয়ে ভয়ে জ্ঞানদাকে বললুম এটা কী অগণতান্ত্রিক হয়ে গেল না জ্ঞানদা? জ্ঞানদা সটান বললে, দেখলি তুই দিন কে দিন কেমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছিস? তা হবিই তো! একে গেরুয়াপন্থী, তারপর অশিক্ষিত। তা সেদিনও বাজারদরের প্রশ্ন করে ভয়ে ভয়ে আছি, আবার তো সেই অশিক্ষিত, গৈরিকীকরণ, অসহিষ্ণুতা এসবই শুনব। তা তেমনটাই শুনলাম বটে তবে একটু অন্যভাবে, বল দেখি অশিক্ষিত কাকে বলে?' ভাবলাম সার্টিফিকেট দিয়ে কী শিক্ষিত যাচাই করা যায় গো বলে আমিই একটু না হয় জ্ঞান দেব! তার আগেই ঘনাদা কাম টেনিদার ঢঙে জ্ঞানদা বলে চলল, বাছাধন মনে রাখিস সেনমশাইকে মানলেই শিক্ষিত, না মানলেই অশিক্ষিত।

জিজ্ঞেস করি তা সেনমশাই যদি বলে রাম বাঙ্গলার সংস্কৃতি নয়, মারার জন্য নাকি 'জয় শ্রীরাম' ব্যবহৃত হয় তখন পাল্টা যুক্তি দেব না? জ্ঞানদা ধমকে উঠে বলল রাখ তোর যুক্তি। জেনে রাখ যুক্তিবাদীরা যুক্তি শোনে না, 'সহিষ্ণু'রা প্রয়োজনে অসহিষ্ণু হয়ে যায়, আমরা কমিউনিস্টরা ভগবানে বিশ্বাস না করলেও ভক্তের তো ভগবান থাকতেই হয়, আমাদের মতো ভক্তের ভগবান তো একজনই রে, তিনি সেনমশাই।

বারবার সেনমশাই, সেনমশাই করাতে মিষ্টির খিদেটা কেমন চাগাড় দিয়ে উঠছিল, এবার বুঝতে পেরে বললাম— ও, তুমি অম... জ্ঞানদা ধমকে উঠে বললেন, তুই মর্ত্যেই পড়ে থাক, আমরা এখন অমর্ত্যে। মাথাটা কেমন ভোঁ ভোঁ করছিল। সামলে নিয়ে বললুম কিন্তু জ্ঞানদা এতকাল যে শুনছিলুম এই গেরুয়াপন্থীরা নাকি অসুহিষ্ণু, অশিক্ষিত, এরা মোদীর ভক্ত; এখন তোমরা কেন সেনমশাইয়ের ভক্ত হচ্ছ, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছো, আচরণেও তো অশিক্ষিতামো ফুটে উঠছে।

জ্ঞানদা কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, শোন তোকে চুপি চুপি বলি, শিক্ষা হচ্ছে একটা 'বুর্জোয়া' কনসেপ্ট। জে এন ইউতে আমরা জঙ্গি তৈরি করি দেশবাসীকে অশিক্ষিত বলার জন্য। নইলে কেউ মানবে কেন? অন্যকে অসহিষ্ণু না বললে নিজেদের অসহিষ্ণুতা ঢাকবো কী করে? হিন্দু ধর্মকে আঘাত না করলে সেকুলার ভারত তৈরি হবে কী করে? বাঙ্গালিকে আরবীয় সংস্কৃতির ঘোল না খাওয়ালে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করব কী করে? বেশি রাম নাম নিলে যদি সেকুলারিজমের ভূত পালায় বিদেশি লগ্নি ভোগ করব কী করে?

আমি হাঁ করে শুনছিলাম। জ্ঞানদা গলাটা খাদে নামিয়ে বলল— দেখিসনি আমাদের দেবতার মুখোশটা খুলে যেতেই রাজ্য বিজেপি সভাপতির এক নকশালি আই এ এস 'নেমশেক' কেমন ঘৃণা ছড়াচ্ছে, প্রতীচীর দধীচি পরিস্থিতি সামলাতে এগিয়ে আসতে বাজারওয়ালারা কেমন ফেসবুকে 'আজ্ঞা অইসচি কত্তা' বলে সাড়া দিচ্ছে, কবিকন্যার কলম গেছে থেমে, নকশালি এডিটরের গেঞ্জি গেছে ঘেমে। না থাক, আজ আর বাজার করা হলো না। আনন্দে উল্টে-পাল্টে দেখি গে, রগড়টা— গৌতম আর ঘোষজা আবার কী দিলেন! জ্বলুনি বাড়ল নাকি হে?

নাগরিকপঞ্জিকরণ ও নাগরিকত্ব আইন সংশোধন উদ্যোগ ইতিবাচক পদক্ষেপ

নিধুভূষণ দাস

হিন্দু ও মুসলমান আলাদা জাতি। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম। এই কারণেই দুই দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দেশ বদলের অধিকার মেনে নেওয়া হয়। মোটামুটি ২৩ বছর পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে ভারতে এসে অত্যাচরিত হিন্দুরা নাগরিকত্ব পেতেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চকে সীমা ধরে তখনকার বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার ওপার বাংলার হিন্দুদের ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার রদ করে দেয়। ধারণা করা হয়েছিল, ইসলামি পাকিস্তান ভেঙে সৃষ্টি 'ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে' হিন্দুরা নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু স্বাধীনতার চার বছর হতে না হতেই বাংলাদেশ আর ধর্মনিরপেক্ষ থাকেনি। অত্যাচারিত হিন্দুদের ভারতমুখী হতে হয়। কিন্তু দেশভাগজনিত কারণে তাদের দেশ বদলের অধিকার ভারত ফিরিয়ে দেয়নি। পাশাপাশি অর্থনৈতিক কারণে এবং জনবিন্যাস বদলে নেওয়ার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে ওপার বাংলা থেকে মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছে অবিরাম। নির্যাতিত হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়ার ঘটনা স্বীকৃতি পেয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আব্দুল বরকতের সম্প্রতি প্রকাশিত বইয়ে ('Poilitical economy of reforming agriculture-land-water bodies in Bangladesh') এবং মার্কিন মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিক ড. রিচার্ড বেনকিনের বক্তব্যে। অধ্যাপক বরকত লিখেছেন, ''প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু ভারতে চলে যাচ্ছেন। এই হার অব্যাহত থাকলে ৩০ বছর পর বাংলাদেশে কোনো হিন্দু অবশিষ্ট থাকবেন না।'' তিনি লিখেছেন, ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু বর্তমান বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন সাম্প্রদায়িক নির্যাতন এবং বৈষম্যের কারণে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে গড়ে দৈনিক ৭০৫ জন হিন্দু পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করতেন। ১৯৯১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দেশত্যাগের এই হার পাকিস্তান আমলের হারকে ছাপিয়ে যায় বলে লেখা রয়েছে গবেষণা ভিত্তিক এই বইয়ে। আমেরিকার মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও লেখক ড. রিচার্ড বেনকিন সানডে গার্ডিয়ানে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম জনগণনায় দেখা যায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু। ২০ বছর পরে ১৯৭১ সালে যখন পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ হয় তখন হিন্দুরা কমে হয় এক-পঞ্চমাংশ। এর ২০ বছর পর ১৯৯১ সালে সংখ্যাটা কমে এক-দশমাংশের নীচে নেমে যায়। এখন তা এক-পঞ্চদশাংশের কাছাকাছি। ড. বেনকিন স্পষ্ট করেই বলেছেন, বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য করার যে প্রয়াস তা নেহাত জেহাদিদের কাজ, এমন নয়। তাঁর মতে, এর মোকাবিলায় সরকারের নিষ্ক্রিয়তায় সরকারের সমর্থন অনুমেয়। বর্তমান পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানেও সংখ্যালঘুরা নিরাপদে রয়েছেন, এমন নয়।

কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নাগরিকপঞ্জি তৈরি করা এবং নাগবিকত্ব আইন সংশোধন করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এবং খ্রিস্টানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে অসমে নাগরিকপঞ্জি তৈরি হচ্ছে। বলাবাহুল্য, অসম চুক্তির শর্ত অনুযায়ী তা হচ্ছে। এনিয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির লোকেরা হৈচৈ বাধিয়ে দেয় সংখ্যালঘুদের ভোট নিজেদের কবজায় রাখতে। সংখ্যালঘু তোষণের এই রাজনীতি মুসলমানদের কত ভয়ংকরভাবে পিছিয়ে রেখেছে তা সাচার কমিটির রিপোর্টেই স্পষ্ট। ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা স্বাধীনতার পর থেকে মুসলমানদের ভোটার হিসেবে দেখেছেন, তাদের অগ্রগতির পথ দেখাননি।

দ্বিতীয় মোদী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন এন আর সি বা নাগরিকপঞ্জি হবে অন্য রাজ্যেও। স্বাভাবিকভাবেই এই তোষণের রাজনীতি করা ছোটো বড়ো যেসব দলও তাদের অঘোষিত জোট তৎপর থাকবে মুসলমানদের শুধুই নিজেদের ভোটার করে রাখতে। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এই জোট মুসলমানদের বৃহদংশের মধ্যে যে হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছে তা তাদের ভারতীয় জাতীয়তা ও জাতিসত্তার সঙ্গে একাত্ম হতে উৎসাহিত করেনি। তারা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মূলস্রোতে আসতে পারেননি। অর্থাৎ এই তোষণের রাজনীতি আমাদের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় বিকৃতি এনে দিয়েছে। কাশ্মীর নীতিতেও এক ধরনের বিকৃতি স্থান পেয়েছে। এর ফলে হয় মারাত্মক।

একদিকে ভারতীয় মুসলমানদের বৃহদংশের পশ্চাদগামিতা দূর করতে হবে, প্রতিবেশী দেশ থেকে বাধ্য হয়ে ভারতে আগাত হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও খ্রিস্টান শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দান এবং অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে দেশের সম্পদের ওপর তাদের ভাগ বসানো বন্ধ ও প্রতিহত করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনে ঐক্য ও সংহতি আনার আয়োজন করা জরুরি। অন্যথায় ভারত জগৎসভায় তার যথার্থ স্থান নিতে পারবে না।

ভারতের জল সম্পদকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহারের ওপরই নির্ভর করবে দেশের ভবিষ্যৎ

অতিথি কলম

অমিতাভ কান্ত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত বাড়িতে নলবাহিত জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও রূপায়ণের রূপরেখা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে নতুন জল শক্তি মন্ত্রণালয় নামে আলাদা একটি মন্ত্রকও খোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিকতম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে জল সংরক্ষণের উপযোগিতা ও অতীতে জলসংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সকলের ধ্যানধারণা ও জ্ঞান নিয়ে পারস্পরিক বিনিময়ের অনুরোধও করেছেন। দেশের ২৫৫টি জলাভাব আক্রান্ত জেলাতে জলশক্তি প্রকল্পের অধীনে জল সংরক্ষণ বাড়াতে নির্দিষ্ট প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

জলই ভারতের উচ্চহারে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা নিতে চলেছে। একই সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জনজীবনের সার্বিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও জল সংরক্ষণের বড়ো ভূমিকা থাকে। পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার ১৭ শতাংশ ভারতে বসবাস করে কিন্তু বিশ্বের মোট জল সম্পদের মাত্র ৪ শতাংশ ভারতে রয়েছে। আজকের দিনে দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের পানীয় জলের নিজস্ব কোনো উৎস নেই। আবার গ্রামের দিকে শতকরা ৯০ শতাংশ পরিবারে পাইপে করে জল আসা কেউ চাক্ষুষ করেনি।

সারা বিশ্বে ভারত কিন্তু বর্তমানে ভূগর্ভস্থ জলের একাই ২৫ শতাংশ উত্তোলন করে থাকে। বিশ্বের ২০টি জল সংকটে পড়া বৃহত্তম শহরের মধ্যে ৫টি ভারতে অবস্থিত। বিশাল সম্মান নিয়ে এই সংকট- শীর্ষে আমাদের মধ্যে দিল্লি দ্বিতীয়। দিল্লিতে ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) স্থানে মাটির নীচে থেকে জল উত্তোলিত হয়। এর জন্য ইলেকট্রিক পাম্পের খরচ সরকার বহন করে থাকে।

ধান ও আম এই দুটি চাষের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত বেশি সেচের জলের প্রয়োজন হলেও জলাভাব পীড়িত কয়েকটি রাজ্যে এর বড়ো বড়ো চাষ হয়ে থাকে। হেক্টর প্রতি এখানে জলের চাহিদা অত্যন্ত বেশি। পঞ্জাবে এক কিলো চাল উৎপাদনে বিহারের চেয়ে তিনগুণ আর পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে দু'গুণ বেশি জল খরচ হয়। পঞ্জাবের সেচের জলের ৮০ শতাংশই ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার থেকে নেওয়া হয়। আমরা জানিই না বাসমতী চাল রপ্তানি করার মাধ্যমে বাস্তবে বছরে আমরা ১০ ট্রিলিয়ন জলসম্পদ চিরতরে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাহলে, ভারতের মুখোমুখি হওয়া এই বিরাট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা দেশ কীভাবে করবে?

প্রথমত, আমাদের যে সমস্ত জলাশয় ও জল ধরে রাখা যায় এমন স্থানগুলি আছে বা কিছুটা পরিত্যক্ত হয়েছে সেগুলির পুনরুদ্ধার। যা আছে তার পূর্ণ সংরক্ষণ ও যেখানে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়াবার সুযোগ আছে তার সদ্ব্যবহার। প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতের অধীনে নদী, পুকুর, বড়ো নালা, সরোবর ও পাতকুয়ো অবশ্যই আছে। উদাহরণ হিসেবে তেলেঙ্গানার 'মিশন কাকতেয়'র অধীনে ৪৬ হাজার জলাশয় পুনরুদ্ধার হয়েছে। ধন ফাউন্ডেশনের অধীনে কাজ করা ভায়লাগাম ট্যাঙ্কফেড এগ্রিকালচারাল উন্নয়ন পর্ষদের নেতৃত্বে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে ভূগর্ভস্থ জল না তুলে এই সংগৃহীত জলের মাধ্যমে চাষ সফল হয়েছে। জলাশয়গুলির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণও চলছে। এই উদাহরণ সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া একান্ত দরকার।

দ্বিতীয়ত, কৃষিক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার এখন একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে আগাম কৃষকদের ওয়াকিবহাল করে দেওয়া যে নির্দিষ্ট এলাকায় জল ভাণ্ডার কতটা আছে আর সেই অনুসারে তাদের সংরক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে। অন্ধ্রপ্রদেশ সর্বাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তার জল সম্পদে বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর বাস্তবে বেড়েছে। এই সূত্রে প্রযুক্তিবিদদের মত নিয়ে গুজরাট সরকার চাষের জল দেওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সংবাহনে সম্পূর্ণ আলাদা feeder changing পদ্ধতি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ ও জল উভয়ের খরচেই রাশ টানতে পেরেছে।

তৃতীয়ত, সমবায় ভিত্তিতে জলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুষ্ঠ পরিচালনা (বড়ো বড়ো বহুতলের ক্ষেত্রে) জল ব্যবহারকারীদের অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করে নিয়মিতভাবে নিজেদের মধ্যে মত বিনিময় করে অনেক সাশ্রয় করা যায়। মহারাষ্ট্রের হিওয়ারে বাজার গ্রামে গ্রামবাসীরা নিজেরা জলের সুষ্ঠু বণ্টন ও ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে এসে গভীর নলকূপ খনন সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এঁরা নিজেদের মধ্যে জল বিভাজনের নিজস্ব বাজেট তৈরি করেছে। তারা তুলো ও আমের মতো বিপুল জলভোগী কৃষিপণ্যের চাষই বন্ধ করে দিয়েছে। এই গ্রামটির উদ্ভাবনী সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার ৫০০০ গ্রামে জলের অপচয় রুখতে জলকষ্টের গ্রামগুলিতে বাজেট তৈরিতে উৎসাহ দিয়ে সুফল পেয়েছে।

চতুর্থত, ভারতকে চাষের ক্ষেত্রে জল ব্যবহারের দক্ষতায় আমূল পরিবর্তন আনতে

হবে। সারা বিশ্বে দক্ষতার নিরিখে ভারত নিম্নতমদের মধ্যে রয়েছে। একই শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে চীন, ইজরায়েল বা আমেরিকার চাষিদের থেকে ভারতের চাষিরা তিন থেকে ৫ গুণ বেশি জল ব্যবহার করে থাকে। বিশ্বে চালু হওয়া agro climatic Zoning-এর উপদেশ অনুযায়ী চাষিদের নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট পণ্যেরই চাষ করলে সুফল পাওয়া যাবে। দুর্ভিক্ষপ্রবণ বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে মেথির চাষ হয় যেখানে ১৮ থেকে ২০ বার জল দিতে হয়। এক্ষেত্রে ভারতের চাষিদের প্রশিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন আছে। চাষিরা যাতে জল কম ব্যবহার হয় এমন শস্যের চাষ বাড়ায় এবং সেই ধরনের শস্যের ক্ষেত্রে ভরতুকি ও ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য (এম এস পি) বাড়িয়ে তাদের উৎসাহিত করা দরকার। এই সূত্রে মিলেট অর্থাৎ জোয়ার, বাজরা, রাগি এবং ডালের মধ্যে কলাই, অড়হর, ছোলা বা মুগের চাষ বাড়ানো দরকার। প্রথমত এগুলিতে প্রোটিনের মাত্রা বেশি থাকায় 'মিড ডে মিল-এর এবং আই সি ডি এস প্রকল্পের ক্ষেত্রেও বেশি ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে শিশুদের পুষ্টি বাড়ে। সব চেয়ে বড়ো কথা, এগুলি জল সাশ্রয়কারী উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ কৃষি পণ্য।

পঞ্চমত, ভারতের ভূগর্ভস্থ জল সংকোচন সমস্যার একটা বড়ো কারণ দেশের প্রচলিত আইন। বর্তমানে যিনি জমির মালিক তাঁর জমির ওপর পূর্ণ মালিকানা থাকার সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভূমিজ জল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপন সংস্থা রাজ্যে কূপ খননের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। নতুন কূপ খননের অনুমোদন তখনই দেওয়া হয় যখন একই জায়গায় ভূমি থেকে উত্তোলিত জলের পুনরায় চক্রাকারে ভূমিতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়।

ষষ্ঠত, জল ব্যবহারকারীদের থেকে জল বাবদ মূল্য নেওয়ার একটি যুক্তিসঙ্গত ও সময়পোযোগী নীতি দরকার। এটা বলা যায় যে সময়মতো, সহজে পর্যাপ্ত জল পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকলে অনেকেই জল বাবদ অর্থ দিতে উৎসুক। কিন্তু ভয়ানক রাজনৈতিক অনিচ্ছা ও প্রশাসনিক উদাসীনতা এর অন্তরায়। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। জলের মূল্য ধার্য করলে জলজনিত পরিকাঠামো নির্মাণ ক্ষেত্রে বড়ো বিনিয়োগ আনতে পারে।

সপ্তমত, সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে যে চমৎকার ঘটে গেছে সেটি অনুসরণযোগ্য। প্রতিবেশী দেশ মালয়েশিয়ার ওপর বরাবরের নির্ভরতা ঝেড়ে ফেলে সিঙ্গাপুর ব্যবহৃত জলের পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা ফেরানো, বৃষ্টির জল নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষণ, জল যাওয়া ও নিষ্কাশনের সমান্তরাল পাইপ বসানো, জল সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, জলের পরিস্থিতি অনুযায়ী মূল্য হার নির্ধারণ, জল চেতনার জাগরণ ও নিরন্তর এই সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে তারা জলাভাব চিরকালের জন্য মিটিয়ে ফেলেছে।

একটা ভালো খবর যে বাস্তবে তৃণমূল স্তরে সদর্থক কিছু কিছু জিনিস ঘটতে দেখা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলি যথাযোগ্য গুরুত্ব অনুসারে জলসংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির রূপায়ণে আন্তরিকতা দেখাচ্ছে। জলের পুনর্ব্যবহার যোগ্যতার প্রকল্পগুলিও হাতে নেওয়া হয়েছে। মহারাষ্ট্রে জলযুক্ত সিভার, তেলেঙ্গানার মিশন কাকতেয়, রাজস্থানে মুখ্যমন্ত্রী জল স্বাবলম্বন অভিযান, গুজরাটে 'সুজলাং সুফলাং' প্রকল্পগুলি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মহারাষ্ট্রের প্রকল্পটি চাষের সময়ে ক্ষেত্রের জলের যে ব্যবস্থা করেছে তাতে ১১ হাজার গ্রাম খরার কবলমুক্ত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তরেও উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। জব্বলপুর, ইন্দোর ও গোয়ালিয়রে যদি বৃষ্টির জল সংরক্ষণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে সেক্ষেত্রে সম্পত্তি করে বাড়তি ছাড়া দেওয়া হচ্ছে। তেলেঙ্গানায় ১৭ হাজার ছোটো ছোটো ডোবাকে সেচের জলাধারে পরিণত করে প্রায় ১৯ লক্ষ একর কৃষি জমিতে সঞ্চিত বৃষ্টির জল সরবরাহ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে নীতি আয়োগ জল সংরক্ষণের ২৮টি নির্দিষ্ট মানদণ্ড ঠিক করে বিভিন্ন রাজ্যগুলির পারস্পরিক অবস্থান যাচাইয়ের ব্যবস্থা করেছে।

আমরা একটি জলসঙ্কটহীন ভারত গড়তে চাই। আমাদের নিজস্ব জল সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ ব্যবহারই ঠিক করে দেবে ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ।

প্রজ্ঞা প্রবাহের দক্ষিণবঙ্গ শাখা লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে
পুস্তক উন্মোচন অনুষ্ঠান

পুস্তকের নাম— **অমর ভারত অজেয় ভারত**
লেখক— ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার
দিনাঙ্ক— ৬ আগস্ট,২০১৯

১ম পর্ব

সময় দুপুর ১.৩০ থেকে ৩.৩০
স্থান— বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরি, (বেলুড় মঠ থেকে ৫ মিনিট হাঁটা পথ)
উপস্থিতি— **স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দজী মহারাজ**
উপাচার্য, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়
সুরেশ সোনী, সহ-সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ
জে নন্দকুমার, প্রজ্ঞাপ্রবাহ, অখিল ভারতীয় সংযোজক

২য় পর্ব

বিকেল ৪.১৫ থেকে ৪.৪৫
স্থান— বেলুড় মঠ প্রঙ্গণে প্রেসিডেন্ট মহারাজের ভবন
উপস্থিতি— **স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ**
পঞ্জীকরণের জন্য যোগাযোগ— **লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ৯৮৩১৫৬৪০৪১**

রম্যরচনা

তোয়ালে চোর

স্কুলে সাঁতার ক্লাসে একটি ছেলের তোয়ালে চুরি গেছে। পরেরদিন ছেলের বাবা স্কুলে গিয়ে রেগে ক্লাস টিচারকে বলল—

আমার ছেলের সঙ্গে যারা পড়ে তারা সব এক একটা চোর। বলুন কে আমার ছেলের তোয়ালে চুরি করেছে? এই শিক্ষা দেন আপনারা ছেলেদের?

ক্লাস টিচার—

এরকম নয় স্যার,ভুল করে অন্য কোনো ছেলের ব্যাগে হয়তো চলে গেছে। আমরা খোঁজ করে দেখছি। আপনার ছেলের তোয়ালে কেমন দেখতে?

ছেলের বাবা—

সাদা রঙের তোয়ালে।

ক্লাস টিচার—

কিন্তু সাদা রঙের তোয়ালে তো অনেক ছেলের কাছে আছে। আপনার ছেলের তোয়ালে কোনো চিহ্ন আছ কি?

ছেলের বাবা—

তোয়ালের ওপর ‘ভারতীয় রেল’-এর ছাপ দেওয়া আছে।

উবাচ

“যারা ভূতকে ভয় পায়, রামনামে ভয় তাদেরই। এখন পর্যন্ত সাতজন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে লাইন দিয়ে আছেন।”

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ

গোঘাটে দলীয় পদযাত্রায় অংশ নিয়ে মমতা ব্যানার্জির সাম্প্রতিক আচরণ প্রসঙ্গে

“শেষ সময় চলছে, তাই রাহুর দশা কাটছে না মমতা সরকারের। যা করছে তা সবই ভুল। ওই সরকার টিকবে না।”

অর্জুন সিংহ
বিজেপি সাংসদ

ব্যারাকপুরের নাগরিক মঞ্চের ধরনায় বক্তব্যে

“মুখ্যমন্ত্রী এখন আবোলতাবোল কথা বলছেন। দল এখন উঠে যাওয়ার পথে। নিজের ডাল নিজেই কেটেছেন কালীদাসী মমতা। দলের লোকেরা কাটমানি খাচ্ছে, আগে ব্যবস্থা নেননি কেন?”

প্রদীপ ভট্টাচার্য
কংগ্রেস সাংসদ

তৃণমূলের কাটমানির প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে

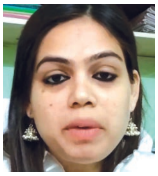

“মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষযাত্রায় রাম নাম শোনানো হবে নাকি বিসমিল্লা বলা হবে, তা জানতে চাই।”

নাজিয়া ইলাহি খান
বিজেপির সংখ্যালঘু নেত্রী তথা আইনজীবী

বারাসাতে বিজেপির সভায় মমতা ব্যানার্জির উদ্দেশ্যে

শক্তিশালী ভারত গঠনে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনর্গঠন দরকার

কে. এন. মণ্ডল

ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পরিচালিত দেশসমূহের একটি বিতর্কিত বিষয়। পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশ যেমন ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, তথা আমাদের ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বর্তমান। এমনকী তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক দেশ চীন-রাশিয়াতেও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও চীনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্ক আছে—ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ-এমনকী বিচার ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রিত কিনা তাও ধোঁয়াটে। অনেকে মনে করেন চীনের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ও শিল্পে পরিকাঠামো নির্মাণ, সামরিক ও মহাকাশ বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অনুরূপভাবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে ধ্বসে যাওয়া বিচ্ছিন্ন রাশিয়ার ঘুরে দাঁড়ানোর ম্যাজিকও নাকি সেই শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার। সফল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ওখানে ৫০টি অঙ্গরাজ্য তাদের নির্ধারিত ক্ষমতার গণ্ডিতে থেকে যেমন নিজ নিজ রাজ্যের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম, তেমনি সংবিধানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থান রয়েছে—যা দেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা বিধান-সহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশটির সম্মান ও সম্ভ্রম আদায়ে সক্ষম।

ভারতের সংবিধান বিশ্বের সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান এবং এখানেও একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সরকার বর্তমান। মানুষের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে এপর্যন্ত ১০৩ বার সংশোধিত হয়েছে ভারতের সংবিধান। ভারতে রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্র এবং রাজ্যে ভিন্ন সরকার থাকায় ক্ষমতা বণ্টন এবং তার প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক চলছে এবং সংবিধান লঙ্ঘনের অভিযোগ তথা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ব্যর্থ রাজ্য সরকারগুলির রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। মনগড়া যুক্তিহীন কেন্দ্র বিরোধিতা বামপন্থীদের যুগ যুগ ধরে ক্ষমতা ভোগের হাতিয়ার হয়েছে এবং বর্তমান তৃণমূল সরকার একই অস্ত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তৃণমূল নেত্রী ধরে নিয়েছেন, জার্মান নেতা জোসেফ গোয়েবলস্-এর মতো মিথ্যা প্রচারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে সব যুদ্ধ জেতা যাবে---তা যে সম্ভব নয় গোয়েবেলস্-এর পরিণতিতে তা প্রমাণিত। মিথ্যার আশ্রয়, বিভ্রান্তির সুযোগে সাময়িক সাফল্য এলেও তা দীর্ঘায়িত ফল প্রদান করে না। কারণ হাজার বার বললেও 'মিথ্যা' মিথ্যাই থেকে যায়, সত্যে রূপান্তরিত হয় না। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃণমূল নেত্রীর উত্থাপিত একটি অভিযোগও সত্য প্রমাণিত হয়নি। তাছাড়া সংবিধান বহির্ভূত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রাজ্য আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। বিশেষত সারদা-নারদায় তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে জনগণের করের টাকা খরচ করে সিবিআই তদন্ত ঠেকানোর চেষ্টা, রাজ্যে নিরপেক্ষ এবং অবাধ পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ ঠেকাতে রাজ্য উচ্চ আদালত এবং সর্বোচ্চ আদালতের দরজা ঠকঠকাতে কসুর করে না। বরং কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারভুক্ত নির্দেশাবলী না মানার দায়ে যেমন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকায় রাজ্যের নামে প্রকল্প চালানো, কল্যাণমূলক বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বেরিয়ে এসে ওই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের বঞ্চিত করা, ভারতের নিরাপত্তা বিষয়ক নানা প্রকল্পে অসহযোগিতা, রোহিঙ্গাদের আশ্রয় না দেওয়ার কেন্দ্রীয় নির্দেশ লঙ্ঘন ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির সুবিধা নেওয়া ইত্যাকার ঘটনা প্রমাণ করে যে রাজ্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের রাস্তায় যাচ্ছে রাজনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তির আশায়। তবে ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রায় শতাধিক মানুষের জীবনহানি, বহু মানুষকে ভোট প্রদানে বাধা দান ও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের পরেও 'আইন শৃঙ্খলা রাজ্যের তালিকাভুক্ত' বিষয় বলে কেন্দ্রের নীরবতা ভারতবাসীকে বিস্মিত করেছে এবং নিশ্চিতভাবে ভারতীয় গণতন্ত্রকে কালিমালিপ্ত করেছে। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা বহু ভাষা ও সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে (প্রায় ৬ শতাধিক নৃপতি শাসিত রাজ্য ভারতে অন্তর্ভুক্ত করে) এবং তৎসহ প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে, একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সংস্থান রাখে—তার মূল সুর কিন্তু 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'। এ কারণেই ভারতের সংবিধান বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের সংবিধানে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা রয়েছে (Federal system with unitary bias)।

> **জম্মু ও লাদাখের মানুষের আলাদা সংস্কৃতি এবং অধিকার রক্ষায় তাদের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে জম্মু এবং লাদাখকে দু'টি আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া সঙ্গত। এর ফলে কাশ্মীর উপত্যকার প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী হবে যা উগ্রপন্থা মোকাবিলায় এবং কাশ্মীরিদের উন্নয়নের সহায়ক হবে।**

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে নিজেদের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে সাধারণের দৃষ্টি ঘোরানোর মোক্ষম অস্ত্র কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে কামান দাগানো—'রাজ্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ, কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজ্যকে হেনস্থা' ইত্যাদি। এনডিএ সরকারের গত ৫ বছরে দেখা যাচ্ছে এ ধরনের ভিত্তিহীন বৈষম্য এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের অভিযোগে

পশ্চিমবঙ্গ ভারত সেরা। প্রশাসনিক অপদার্থতা, প্রশাসনকে এবং পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা, পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা এবং সিন্ডিকেট ব্যবস্থা, শিল্পক্ষেত্রে খরা এবং কর্মসংস্থানে ব্যর্থতা থেকে জনরোষ প্রতিহত করতে কেন্দ্র বিরোধিতাই মোক্ষম অস্ত্র। তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের দাবি করেন---যেমন গ্রামীণ সড়ক যোজনায় রাস্তাঘাট তৈরি, গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, ১০০ দিনের কাজে সাফল্য তা কিন্তু সবই কেন্দ্রীয় প্রকল্প। সকলের জন্য গৃহ প্রকল্প (প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা) এবং প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় যে কাজ হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ আছে এবং তার বাস্তবতার কারণেই মুখ্যমন্ত্রী বখরা খাওয়া নেতাদের (cut money) উপভোক্তাদের টাকা ফিরিয়ে দিতে বলছেন এবং শোনা যাচ্ছে নবান্নে নাকি এজন্য কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে। (অবশ্য বিরোধীরা কেউ কেউ দাবি করছেন—কালীঘাটে একটি কন্ট্রোলরুম খোলার জন্য)। রাজ্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য দেশের সেরা—এমনকি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত (যেমন ১০০ দিনের কাজ এবং কন্যাশ্রী) সেখানেও প্রচুর জল মেশানোর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ আছে, এসব নাকি মাস্টার রোলের সাফল্য। কাজ না করিয়ে ১০০ দিনের কাজের মজুরি ভাগাভাগির কাহিনি। প্রকৃত তদন্ত হলে এবং কেন্দ্রীয় অডিট হলে সব সত্য প্রকাশিত হবে (প্রাথমিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষ্যকে cut money ফেরতকে গুরুত্ব দিয়েই)। জনগণের করের টাকা (তা রাজ্যের হোক বা কেন্দ্র থেকেই আসুক) তা কাটমানি (১০-২৫% বখরা) নিয়ে খরচ করার রেকর্ডে (ভারত সেরার শিরোপা) কী গরিমা আছে তা সাধারণের বোধগম্য নয়। তবে, এটা সবাই বোঝেন—কমিশন দিয়ে কাজ করানোর জন্য পঞ্চায়েত বা পুরসভার জনপ্রতিনিধিদের থেকে এই কাজ মাত্র ১% কমিশনে বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওদের মাধ্যমে করা যায়। সরকার পোষ্য সংবাদ মাধ্যমে অ্যাড দিলেই ওইরকম সব সংস্থা হুমড়ি খেয়ে পড়বে কাজের দায়িত্ব পেতে। যে কাজের জন্য কোনো দায়িত্বশীল সরকারের গর্ব হওয়া উচিত তা হচ্ছে, আইনের শাসন কায়েমের মাধ্যমে রাজ্যের সকল নাগরিকের (দলমত নির্বিশেষে) জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, সকল নাগরিকের জন্য বাসস্থান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং উন্নত মানের শিক্ষা পরিকাঠামো তৈরি এবং দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন প্রদান। এছাড়াও কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, যেমন সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিরতিহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ, উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং বাজারকরণে সহায়তা আর একটা অবশ্য করণীয় বিষয়। বেকার সমস্যা সমাধানে সরকারি ক্ষেত্রে কর্মী নিয়োগ এবং শিল্পে (সরকারি/বেসরকারি) বিনিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অবশ্যকরণীয় কাজটিকে গুরুত্বহীন বা গুরুত্বের নিরিখে পিছনে ঠেলে দিয়ে ভোটকেন্দ্রিক দেখনদারি উন্নয়নে শামিল করেছে দলকে। গ্রামের দিকে নতুন নতুন ঢালাই রাস্তা হচ্ছে অথচ নর্দমার অভাবে বর্ষায় ডুবে থাকে ওই রাস্তা। বিদ্যুৎ সংযোগ হচ্ছে কিন্তু প্রায়ই লোডশেডিং বা লো-ভোল্টেজ থাকছে। অর্থাৎ এধরনের কাজে মানুষের সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্য এলেও দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাচ্ছে না মানুষ। তার উপরে রয়েছে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনে দলের মনসবদারেরা যে সম্পদ করতে পারেনি ৮ বছরের মধ্যে তার শতগুণ সম্পদের মালিক ছোট-বড় তৃণমূল নেতা-নেত্রীরা।

প্রসঙ্গত জনশ্রুতি আছে, ভারতের সংবিধানে ৩৭০ ধারার অন্তর্ভুক্তির বিলম্বের কারণ (১৯৫৪ সালে) নাকি ড. বি. আর. আম্বেদকরের আপত্তি। জওহরলাল নেহরু গোপাল স্বামী আয়েঙ্গারকে দিয়ে পরবর্তীকালে এর খসড়া তৈরি করান। যা ভারতীয় সংবিধানের অঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু আরেকটি বিতর্কিত ধারা ৩৫এ জম্মু-কাশ্মীর সরকারকে যে আলাদা নাগরিকত্ব আইনের অধিকার প্রদান করে (Resident ritht) তাও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আগ্রহে হয় এবং সংবিধান সংশোধন না করেই রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের আদেশ বলে এ কাজটি করানো হয়। যার জন্য কাশ্মীর উপত্যকা বাদে জম্মু-কাশ্মীরের বাকি এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। ভারতের বহু বিধানের মতো ভারতীয় নাগরিক আইনও জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য নয়।

এতদিন ভারতের প্রায় সবাই জেনেছেন যে কাশ্মীরের জন্য একটি আলাদা নিশান এবং সংবিধান রয়েছে। ভারতের কোনো আইন জম্মু-কাশ্মীরে চালু হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতি এই মর্মে আলাদা আদেশ জারি করছেন। এই বৈষম্য কাশ্মীরিদের বাকি ভারত থেকে আলাদা করে রেখেছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে উৎসাহিত করছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সব অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই বিকাশ ও জনগণের আশা-আকঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর সংস্থান রয়েছে। কাশ্মীরিদের একটি বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করতে হবে। উগ্রপন্থা কাশ্মীরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে রাখতে সমর্থ হলেও কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। সুতরাং ৩৭০ ধারা, ৩৫এ ধারার কলঙ্ক কেন বহন করবে তারা, বরং মূলস্রোতে যুক্ত হলে কাশ্মীরিদের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি সম্ভব। তাছাড়া, উপত্যকা থেকে জম্মুর আয়তন প্রায় দ্বিগুণ এবং লাদাখের চারগুণ—এছাড়াও ভাষা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং, জম্মু ও লাদাখের মানুষের আলাদা সংস্কৃতি এবং অধিকার রক্ষায় তাদের ভাবাবেগকে মর্যাদা দিয়ে জম্মু এবং লাদাখকে দু'টি আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া সঙ্গত। এর ফলে কাশ্মীর উপত্যকার প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী হবে যা উগ্রপন্থা মোকাবিলায় এবং কাশ্মীরিদের উন্নয়নের সহায়ক হবে।

২০১৯-এর নির্বাচন ছিল বিভেদকামী, ক্ষমতালিপ্সু এবং জাতীয়তা বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী, সবল ও সাহসী তথা দুর্নীতিমুক্ত জাতীয়তাবাদী সরকার গঠনের গণভোট। এই গণতন্ত্রের উৎসবে আসমুদ্র-হিমাচল শামিল হয়েছে নরেন্দ্র মোদীর হাতে পর্যাপ্ত গরিষ্ঠতা দিতে যাতে বিগত সরকারের আনীত তামাদি হওয়া নাগরিক বিল সহ সমস্ত গণমুখী বিলগুলি পাশ তথা প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতা বিরোধী সমস্ত কণ্টক দূর করে বিশ্বে ভারত রাষ্ট্রকে অন্যতম মহান ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। নরেন্দ্র মোদী সরকার এই সুযোগকে কতটা কাজে লাগাতে পারে তা দেখার।

(লেখক কে. এন. মণ্ডল ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের মুখ্য প্রবন্ধক)

রাজ্য রাজনীতি

কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ অমিত শাহের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ

সনাতন রায়

২০১৯-এ প্রায় সব রাজনৈতিক শক্তিকে পিছনে ফেলে অমিত বিক্রমে দেশের শাসন ক্ষমতায় আবার আসীন হয়েছে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। আর সেই সরকারের দ্বিতীয় লৌহপুরুষ হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আসনে বসানো হয়েছে অমিত বিক্রমশালী, ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য-মস্তিষ্ক অমিত শাহকে। এবং নিদ্বির্ধায় বলা যেতে পারে, মন্ত্রিসভা গঠনের একেবারে প্রথম পর্যায়েই এই সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর একটা মাস্টারস্ট্রোক। মাস্টারস্ট্রোক বলছি এই কারণেই যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সামনে এবার নির্বাচনোত্তর পরিবেশে আশু দুটি চ্যালেঞ্জ হলো :

১। কাশ্মীর উপত্যকার ওপর থেকে ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারার রক্ষাকবচ তুলে যেওয়া।

২। নাগরিকত্ব আইন সংশোধন ও নাগরিক পঞ্জীকরণের কাজ শুরু করা।

এবং এই ভয়ংকর স্পর্শকাতর বিষয় দুটি সঠিকভাবে রূপায়ণ ও তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া সামলাতে প্রয়োজন ছিল অমিত শাহর মতোই মানসিক শক্তি ও চাণক্যসম মস্তিষ্কের। মোদীজী জানেন, গোটা দেশের সামনেও এই দুটি বিষয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দুটি বিষয়ই ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং জনসংখ্যার বিস্ফোরণের মোকাবিলায় সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। নির্বাচনী প্রচারেও বিজেপি এই দুটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিল বেশি। রাজনৈতিক সেই প্রচারে বিশ্বাস রেখেছে মানুষ। এখন মানুষের প্রত্যাশার চাপ বাড়বে প্রতিদিন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে সেই প্রত্যাশা পূরণের পথে এগোতে হবে এখনই।

কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যদিও দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ক্ষণে কাশ্মীরই হয়ে উঠেছিল তৎকালীন ভারত সরকারের কাছে এক জ্বলন্ত সমস্যা। সমস্যা মেটাতে সংবিধানে যুক্ত হয়েছিল ৩৭০ ধারা যা কাশ্মীরে বসবাসকারী জনগণের তৎকালীন প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশেষ কিছু নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সহজে পেতে সাহায্য করেছিল।

ঠিক একইভাবে প্রয়োগ হয়েছিল ৩৫-এ ধারা যেখানে বলা হয়েছে, কাশ্মীরে জমিজমা ও সম্পত্তি ক্রয়বিক্রয় করার অধিকার থাকবে শুধু কাশ্মীরবাসীর। অন্য রাজ্য বা রাষ্ট্রের মানুষের সে অধিকার থাকবে না। এমনকি বিবাহসূত্রে অন্য রাজ্যের মহিলা কাশ্মীরের পরিবারের সদস্য হলেও, তাঁকেও কাশ্মীরে কোনো সম্পত্তি কেনার অধিকার দেওয়া হবে না।

৭০ বছর আগে যে অধিকার দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, ইতিমধ্যে ঝিলম, বিপাশা, শতদ্রু নদীতে হাজারো স্রোত বয়ে গেলেও, কেন্দ্রের কোনো সরকারই আইনের ওই রক্ষাকবচগুলি সরাবার সাহস করেনি। মোদী প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কাশ্মীর সমস্যার অন্যতম এই কারণ দুটিকে নির্মূল করতে হবে। নানা কারণে প্রথম ধাপে তা সম্পন্ন করা যায়নি। কিন্তু এবার তিনি বদ্ধপরিকর। মানুষের রায় পেয়েছেন। একই দেশের মধ্যে আইনের দ্বৈত সত্তা নির্মূল করার রায়। আর সে দায়িত্ব নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর।

আরও বড়ো দায়--- দেশকে অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে জনবিস্ফোরণের বিপদমুক্ত করা। এজন্য একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পথ নাগরিক পঞ্জীকরণ এবং তা সম্পূর্ণরূপে রূপায়ণের

জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ ইন্সপেক্টর নিহত আরসাদ আহমেদের পরিবারের সঙ্গে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ।

জন্য পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা। গত পাঁচ বছরে বিজেপি চেষ্টা করেছে, কিন্তু সংখ্যালঘু তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলির তীব্র বাধায় তা সম্পূর্ণ করা যায়নি। এবার মানুষ রায় দিয়েছে তোষণের বিরুদ্ধে। বেআইনি অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে এবং প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে।

স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের কংগ্রেস প্রশাসনের ওপর ভারতবাসী চোখ বুজে বিশ্বাস রেখেছিল যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতায় দ্বিতীয়বার হাত পড়বে না। ভারতবাসী শঙ্কিত হবে না আরও একবার ভারতীয়ত্ব এবং হিন্দুত্ব হারাবার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবং দুর্ভাগ্যজনকও বটে, রাজনৈতিক ক্ষমতায় টিকে থাকার লোভে সংখ্যালঘু তোষণের মাত্রা কংগ্রেস সহ বহু জাতীয় ও আঞ্চলিক দল (ব্যতিক্রম শুধুমাত্র বিজেপি) এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যায় যে এখন গোটা ভারতবর্ষ শঙ্কিত— হয়তো শতাব্দী শেষের আগেই নিজ দেশে পরবাসী হতে হবে ভারতবাসীকে। হয়তো আরও একবার হারাতে হবে স্বাধীনতা। কেননা— দেশ জুড়ে চলেছে বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশ আর মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের জনবিস্ফোরণ। একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ১৯৯১-২০০১ সালের মধ্যে গোটা দেশে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে ২৯.৫২ শতাংশ হারে। সেখানে হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৯২ শতাংশ। গোটা বিশ্বের হিসেবে পাকিস্তান এবং ইন্দোনেশিয়ার পর ভারতবর্ষ হলো তৃতীয় রাষ্ট্র যেখানে মুসলমান জনসংখ্যার হার বেড়ে চলেছে তীব্র গতিতে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ— যেখানে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং রাজ্যের ৩৪ বছরের জরদগব বামফ্রন্ট সরকার বাংলাদেশী মুসলমানদের জন্য রাজ্যের দরজা উন্মুক্ত করে রেখেছিল শুধুমাত্র সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে পুষ্ট করার তাগিদে। ফলে ১৯৮১ থেকে ২০১১— এই ৩০ বছরে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়ে গেল ৫.৫ শতাংশ। ২০১১-র হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনসংখ্যা হলো মোট জনসংখ্যার ২৭.০১ শতাংশ যা ১৯৫১ সালে ছিল ১৯.৮৫ শতাংশ। এই মুহূর্তে সরকারি হিসেব না পেলেও মুসলমান জনসংখ্যা কমপক্ষে ৩০/৩১ শতাংশ তো বটেই। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের রাজনীতি পুরোপুরি খোলামেলা যেখানে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই সাংবাদিক সম্মেলনে তা স্বীকার করে নেন এই বলে— 'যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি তো খেতেই হবে।' এর ফলে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনভিত্তিটাই নষ্ট হতে বসেছে। লোকসভা কেন্দ্রের শুধুমাত্র ভোটারদের সংখ্যা হিসাব করলেই জনভিত্তির পরিমাপটা পরিস্কার হয়ে যাবে। যেমন মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্র। এখানে হিন্দু ভোটার ২৬.২২ শতাংশ। মুসলমান ভোটার ৭৩.৬৮ শতাংশ। বহরমপুরে হিন্দু ভোটার ৩৯ শতাংশ। ভোটার ৬০.২২ শতাংশ। মালদা উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে হিন্দু ভোটার রয়েছেন ৫০.৬৮ শতাংশ। মুসলমান ভোটার রয়েছেন ৪৯.২৯ শতাংশ। মালদা দক্ষিণে হিন্দু ভোটার সংখ্যা মাত্র ৩৪.৯২ শতাংশ আর মুসলমান ভোটার অনেক বেশি ৬৫.০২ শতাংশ। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে এখন মুসলমান ভোটার ৫৩.০৫ শতাংশ। হিন্দু ভোটার রয়েছে ৪০.৮৫ শতাংশ। এমনকি বীরভূম, উলুবেড়িয়া, কৃষ্ণনগর, ডায়মণ্ডহারবার, বসিরহাট ইত্যাদি অঞ্চলেও সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে অস্বাভাবিক হারে। সবচেয়ে দুঃশ্চিন্তার বিষয়— মোট মুসলমান জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশই হলো ৬ বছর থেকে ২৭ বছর বয়সী। তুলনায় বৃদ্ধ বা অতি বৃদ্ধের সংখ্যা যথেষ্ট কম। ঠিক এই হারে যদি পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে ২০৫০ সালে গোটা রাজ্যে হিন্দু হয়ে যাবে সংখ্যালঘু। মুসলমান হবে সংখ্যাগুরু। তখন পশ্চিমবঙ্গ হয়তো পরিচিত হবে পশ্চিম বাংলাদেশ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানেন মোদীজী। জানেন অমিত শাহও। পশ্চিমবঙ্গবাসী এবার বিজেপিকে উজাড় করে ভোট দিয়েছে বা দেবার চেষ্টা করেছে শুধুমাত্র জাতিসত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে। মুখ্যমন্ত্রী যতই চীৎকার করুন— পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক পঞ্জীকরণ করতে দেবেন না, তাঁর সে চীৎকার জনরোষের চীৎকারে ঢাকা পড়ে যাবে। 'স্বাগতম্ অমিতজী' ধ্বনিতে মুখর হবে পশ্চিমবঙ্গ। হবেই। পশ্চিমবঙ্গবাসীর এটাই প্রত্যাশা। এটাই আশ্বাস। ■

বিশেষ সংখ্যা

নরেন্দ্র মোদীর দ্বিতীয় ইনিংস

এবার লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপির কল্পনাতীত সাফল্য। মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ পরপর দু'বার দিল্লির মসনদে আসীন। এবারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেন আরও বেশি জনপ্রিয়, আরও বেশি দৃঢ়সংকল্পিত।

মোদী ঝড়ে ধূলিস্যাত হয়েছে সমস্ত বিরোধিতা ও বিরোধীরা। একি শুধুই 'মোদী' নামের জাদু নাকি গত পাঁচ বছরের তাঁর কাজকে কষ্টিপাথরে পরখ করেই এই বিপুল জনসমর্থন!

নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সরকারের এই সাফল্যের বিভিন্ন দিক নিয়েই থাকবে বিশেষ কয়েকটি লেখা।

প্রকাশিত হবে ২৯ জুলাই '১৯।। সত্বর কপি বুক করুন।

মূল্য ১২ টাকা

ভারতীয় সংবিধানে অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত

অশোক কুমার চক্রবর্তী

সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর আগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কেই ধারণা ছিল। নাগরিকদের যে মৌলিক কর্তব্য বলেও একটি জিনিস আছে, এ সম্পর্কে ধারণা ছিল না। এমনকী ৩ জানুয়ারী ১৯৭৭ সালের সংবিধানের ৫১ (ক), পার্ট ফোর, (ক) অনুচ্ছেদের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি সংযোজিত হবার পরেও রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা শোনা যায় না। তথাকথিত পণ্ডিতগণ ভারতীয় সংবিধানে 'মৌলিক কর্তব্যগুলি' সংযোজিত হওয়ার পরে এই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে, যেহেতু ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতান্ত্রিক' কথাটি সংযোজিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক দেশে নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলিই প্রধান বিবেচ্য এবং সেই কারণেই মৌলিক কর্তব্যগুলি সমাজতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মৌলিক অধিকারগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবার আগে এবং এই কর্তব্যগুলির সংবিধানে যোগসূত্রের কারণ বিশ্লেষণের আগে আমাদের একবার দেখে নেওয়া দরকার যে, কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেমব্লির সদস্যগণ ভারতীয় সংবিধানের রূপায়ণ কীভাবে করেছিলেন। সংবিধানের প্রস্তাবনা পর্বকে বৈদিক সভ্যতার নিরিখে প্রচ্ছদে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। এইভাবে মৌলিক অধিকারগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এবং বাকি অংশগুলি ভগবান নটরাজের সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছিল। এর কারণটি অবশ্যই এই ছিল যে সংবিধান রচয়িতারা সংবিধান রচনার মাধ্যমে দেশ পরিচালনা ও আইনি শাসনের কথাগুলি ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সংস্কৃতি ও পরম্পরার কথাও ভেবেছেন।

বৈদিক সভ্যতায় জ্ঞানের অন্বেষণ, মুক্তি, আত্মিক সংশোধন ইত্যাদি কথা বারবার প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশের মহান ঋষিরা তাঁদের নিজেদের জীবনে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির গবেষণা করেছিলেন শ্রুতি এবং স্মৃতির সঙ্গে। তাঁদের গার্হস্থ্য জীবন আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন, দেশ, কালের প্রতি মৌলিক কর্তব্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরা রক্ষা করার মৌলিক কর্তব্যে সজাগ ছিলেন। সেই জন্যই সংবিধানে সংযোজিত মৌলিক কর্তব্য কথাটি হঠাৎ আকাশ থেকে ভেঙে পড়েনি বা সেটি তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গেই কেবল যুক্ত নয়, বরং সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সমাজ ও সভ্যতাকে ধারণ করার জন্য মৌলিক কর্তব্যগুলি একটি পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করেছে। অথর্ব বেদ এবং বেদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডে মৌলিক কর্তব্যগুলির কথা আলোচনা করা আছে। একইভাবে ভারতবর্ষের উপনিষদগুলি ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি। ঈশোপনিষদের শুরু :

'ঈশা বাস্যমিদঁ সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা সা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্।।'

—জগৎ ও বিশ্ব ঈশ্বর দ্বারাই পরিব্যাপ্ত। তিনিই সর্বশক্তিমান এবং পূর্ণ। তিনি আমাদের আদেশ করছেন তাঁকে স্মরণ করতে। আর আগে ত্যাগ এবং তারপরে ভোগ করতে। অর্থাৎ ঈশ্বরের পূজাস্বরূপ কেবলমাত্র মৌলিক কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই বিষয় সমূহের যথাবিধি উপভোগ করা যায়।

কঠোপনিষদে ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরায় পিতার প্রতি পুত্রের মৌলিক কর্তব্যের এক আদর্শ উদাহরণ হয়ে রয়েছে। মহর্ষি উদ্দালকের পুত্র নচিকেতা পিতার যজ্ঞে ব্যবহৃত দানসামগ্রী সঙ্গে পিতাকে প্রশ্ন

পিতামাতার ক্ষেত্রে ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের পুত্রকন্যার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য, নারীদের সম্মান রক্ষার জন্য, ভ্রাতৃত্ববোধের রক্ষার জন্য, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার উচ্চমার্গীয় ধ্যান ধারণার রক্ষার জন্য, সংবিধানে ৫১ (ক) ধারায় মৌলিক কর্তব্যগুলি সংযোজিত হয়েছে। সেজন্যই সংবিধানের তৃতীয় বিভাগে মৌলিক অধিকার, চতুর্থ বিভাগের নির্দেশাত্মক নীতি, ও চতুর্থ (ক) বিভাগে মৌলিক কর্তব্যগুলি সংবিধানের মূল কাঠামো হিসেবে স্থান পেয়েছে, তার কারণ কল্যাণকর রাষ্ট্রে সবকটিই একে অপরের পরিপূরক।

করেছিল যে তিনি তাকে (নচিকেতাকে) কাকে দান করলেন? অহংকার এবং ক্রোধবশত পিতা নচিকেতাকে যমরাজকে দান করায় নচিকেতা যমালয়ে গিয়ে যমকে সন্তুষ্ট করে ৩টি বর পান। হাজার প্রলোভনের মধ্যেও অনড় থেকে তিনি আত্মতত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব জানতে চান। প্রথম বরের প্রার্থনা ছিল যে তাঁর পিতা অহংকার এবং ক্রোধবশত তাকে যে যমালয়ে নিক্ষেপ করেছেন, তার জন্য পিতার যেন কোনো ক্ষতি না হয় এবং এই কর্মের জন্য তিনি যে মানসিক কষ্ট পাচ্ছেন, তা থেকে যেন মুক্তি পান এবং নচিকেতার প্রত্যাবর্তনের পর যেন তিনি চিনতে পেরে সস্নেহে গ্রহণ করেন। সভ্যতার এবং মানবতার ইতিহাসে পুত্রের পিতার প্রতি এই মৌলিক কর্তব্য একটি আদর্শ হয়ে রয়েছে এবং এই কর্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের দেশের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরম্পরার কথাই উল্লেখ রয়েছে।

মনু মহারাজ তাঁর সংহিতায় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলিকে বহু উদাহরণের মাধ্যমে পৃথকীকরণ করেছেন। এই কর্তব্যগুলি নাগরিকের সমাজের অবস্থান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপরে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাবে দায়বদ্ধতার কথা বলা হয়েছে। সংহিতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে গুরু ও গুরুকুলের মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা আছে। অষ্টম অনুচ্ছেদে রাজার প্রজার প্রতি মৌলিক কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। এবং নবম অনুচ্ছেদে সংসারের পুরুষ ও স্ত্রীর বৈশ্যের ও শূদ্রের মৌলিক কর্তব্য সমাজের প্রতি ও ব্যক্তির প্রতি উল্লেখ করা হয়েছে। গুরুকুল ও ব্রাহ্মণদের মৌলিক কর্তব্য সম্পাদনে অনেক বেশি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থে মৌলিক কর্তব্যের বহু উল্লেখ আছে। যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ, ভগবৎগীতা তার উদাহরণ। মহাভারতের মহামন্ত্রী বিদুরের বাণী রাজা ও প্রজা উভয়ের ক্ষেত্রে মৌলিক কর্তব্য সম্পাদনের একটি নির্দেশাত্মক নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। ওই সকল গ্রন্থ থেকেই কল্যাণকর রাষ্ট্রের কথাটি এসেছে এবং রাজা ও প্রজা উভয়েই রাষ্ট্রের কল্যাণে পরস্পর মৌলিক কর্তব্য সম্পাদনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই সব বাণী আমাদের কাছে মৌলিক কর্তব্যের বার্তা বহন করে এনেছে।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি এ কথাই আমাদের শিখিয়েছে যে মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন না করলে কোনো অধিকার ভোগ করা যায় না। পিতামহ ভীষ্ম ও বিদুর রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বারবার রাজ্যশাসনের দায়বদ্ধতা ও মৌলিক কর্তব্যগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে প্রজারা সুখী জীবনযাপন, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং নানাবিধ রক্ষাকবচ রাষ্ট্রের কাছে তখনই দাবি করতে পারেন, যখন তারা রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করবেন। এই কর্তব্য সম্পাদনের উৎসটি পরিবার থেকে আসে। মনু মহারাজ তাঁর আইনি সংহিতায় এই কথা বলেছেন যে বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্র যদি অর্থনৈতিক ভাবে রক্ষা না করে, তাহলে পিতামাতা রাষ্ট্রের কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করতে পারবেন। মনুসংহিতায় পরিবারের কর্তা কীভাবে ধনসম্পত্তি ভাগবণ্টন করবেন, কন্যার বিবাহ দেবেন, এই সকল মৌলিক কর্তব্যগুলির বিশদ আলোচনা আছে।

প্রাচীন ভারতের রাজধর্ম কথাটি রাজার প্রজাকল্যাণের মধ্যেই নির্দেশিত ছিল এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাঁর জীবনের ত্যাগের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাকল্যাণের দিক্‌নির্ণয় করে গেছেন। সার্বিকভাবে তাই যারা মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন করেন— পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি, তারাই ধর্মাচরণ করেন।

ভারতীয় সংবিধানের ৩০৫, ৩৭২, ৩৭২ (ক) অনুচ্ছেদে সংবিধান পূর্ববর্তী সংস্কৃতি ও প্রথাগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকার, নির্দেশাত্মক নীতি ও মৌলিক কর্তব্যগুলি তাই একে অপরের পরিপূরক হিসেবে অবস্থান করছে। মৌলিক অধিকারগুলি নাগরিকদের ক্ষেত্রে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আর মৌলিক কর্তব্যগুলি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির অনেক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা আছে। আদালতের কাছে যদি কোনো বিশেষ প্রশ্ন ওঠে যে জাতীয় স্বার্থ অগ্রাধিকার পাবে কিনা একটি ব্যক্তির মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে, আদালত জাতীয় স্বার্থকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যেতে পারবে না। কেবলমাত্র চরমতম পর্যায়ে কোনো নাগরিকের জীবন যদি দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, আদালত সেরকম ক্ষেত্রে কিছু কিছু নির্দেশ দিতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামো হলো, ভারতীয় সংবিধান নাগরিকগণের সার্বিক কল্যাণের কথাই ব্যক্ত করবে এবং তা প্রয়োগ করতে গিয়ে নাগরিকদেরও মৌলিক কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ কোনো ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতা তার মতামত প্রকাশের মৌলিক অধিকার ব্যক্ত করতে গিয়ে যদি ভারতীয় সংবিধান, জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় পতাকার অসম্মান করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে, তার কারণ ভারতীয় সংবিধানকে মর্যাদা দেওয়া, জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেওয়া, ভারতীয় সার্বভৌমত্ব ও একতা রক্ষা ইত্যাদি ৫১ (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই মৌলিক কর্তব্যগুলির মধ্য দিয়েই দেশকে একটি বিশেষ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য নাগরিকদের কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। পিতামাতার ক্ষেত্রে ছয় থেকে চৌদ্দ বছরের পুত্রকন্যার শিক্ষাব্যবস্থার জন্য, নারীদের সম্মান রক্ষার জন্য, ভ্রাতৃত্ববোধের রক্ষার জন্য, ভারতীয় সংস্কৃতি ও পরম্পরার উচ্চমার্গীয় ধ্যান ধারণার রক্ষার জন্য, সংবিধানে ৫১ (ক) ধারায় মৌলিক কর্তব্যগুলি সংযোজিত হয়েছে। সেজন্যই সংবিধানের তৃতীয় বিভাগে মৌলিক অধিকার, চতুর্থ বিভাগের নির্দেশাত্মক নীতি, ও চতুর্থ (ক) বিভাগে মৌলিক কর্তব্যগুলি সংবিধানের মূল কাঠামো হিসেবে স্থান পেয়েছে, তার কারণ কল্যাণকর রাষ্ট্রে সবকটিই একে অপরের পরিপূরক। ■

পাত্র চাই

পাত্রী পঃ বঃ গন্ধবণিক
বয়স ২১+, উচ্চতা ৫' ৩"
বি.এ. (পাশ), ফর্সা, সুশ্রী
উপযুক্ত পাত্র চাই।
যোগাযোগ
গৌতম দত্ত
ডাকঘর : বিষ্ণুপুর
পাড়া - কাটানধার, জেলা - বাঁকুড়া
মোবাইল নং - ৮৬২২৮৭৮৮২০

বিশেষ প্রতিবেদন

সাম্প্রতিককালে সংস্কৃতশিক্ষার উপযোগিতা

পুরীপ্রিয়া কুণ্ডু

গম্-ধাতু হতে নিষ্পন্ন 'জগৎ'-শব্দ গতিশীলতার নির্দেশ দেয়। নিরবধি কালপ্রবাহের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে যুগে যুগে যেমন পরিবেশের পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি মানুষের জীবিকা, দৃষ্টিভঙ্গী, খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা ইত্যাদি সবকিছুই নিত্যনতুন হয়ে উঠছে। আমাদের ভারতবর্ষেও এই নিয়মের বিপর্যয় ঘটেনি। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে মানুষের জীবনধারা যেমন ছিল, রামায়ণ মহাভারতের কালে কিন্তু তেমন ছিল না, আবার পৌরাণিকযুগে পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে; সেই ধারাকে অব্যাহত রেখে অর্বাচীনকালেও প্রতিনিয়ত প্রভূত পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করছি। সংস্কৃতবিরুদ্ধবাদীরা মন্তব্য করেন যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে সংস্কৃত শিক্ষার কোনো উপযোগিতা নেই। সংস্কৃত শাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থে যে প্রাচীন ভাবধারা বিদ্যমান, তা বর্তমানকালে সম্পূর্ণভাবে অচল ও অগ্রগতিবিরোধী। তাঁদের এহেন অভিযোগের উত্তরে বলতে হয়— 'শিক্ষা কী?' —এটাই প্রথম ও প্রধান বিচার্য বিষয়। শিক্ষার প্রথম উদ্দেশ্য হলো— মানবমননের পশুভাব দূরীকরণ করে দেবভাবের উদ্রেক ঘটানো। আহারনিদ্রাদি জৈবপ্রক্রিয়া মানুষ ও পশু উভয়েই সমানভাবে সাধন করে। ধর্মই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং কেবলমাত্র এই ধর্মবোধ অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধই মানুষকে পশুর থেকে পৃথক করে। এই ধর্মের শিক্ষা আমরা আশৈশব শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, মহাজনবিরচিত গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে অর্জন করি। কোনটা নিন্দিত কর্ম অথবা কোনটা বিহিত কর্ম— এটাও গুরুর মুখ থেকে আমরা শুনে জীবনে চলার পথে এগিয়ে যাই। 'ধর্মান্ ন প্রমদিতব্যয়, সত্যান্ ন প্রমদিত্যন্যম্'; 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব'— ইত্যাদি উপদেশবাক্য সমূহ সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থেই নিহিত রয়েছে। শুধু তাই নয়; রামায়ণ মহাকাব্যে রামচন্দ্রের আদর্শ অনুকরণীয়, রাবণের আদর্শ নয়; কিংবা মহাভারত মহাকাব্যে যুধিষ্ঠিরাদির আচরণ শিক্ষণীয়, দুর্যোধনাদির আচরণ নয়— এসব শিক্ষা আমরা সংস্কৃত গ্রন্থরাজি হতেই লাভ করি। এখানেই শেষ নয়, সংস্কৃত প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র সমূহের অনুশীলনের ফলেই মানুষের বুদ্ধি নির্মল হয় এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত জীবনতত্ত্বও মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। তাই সংস্কৃত বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আমার বিনীত প্রশ্ন— সংস্কৃত শিক্ষার যে মৌলিক উদ্দেশ্য, তা কি সম্যক্‌ভাবে বিজ্ঞান সাধনায় কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যায় লাভ করা সম্ভব? বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির রহস্যসমূহ জানতে সমর্থ হই এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে বাণিজ্যাদি বিষয়ে আমরা প্রভূত অর্থোপার্জন করি; কিন্তু এই ধনলাভ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। মনুষ্যত্ব অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধ (নৈতিক বোধ) ব্যতীত ধন মানুষের কাজে লাগে না; সেই অর্থ অনর্থের মূল হয়।

মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সুপ্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের পাঠ অবশ্য কর্তব্য। মহাকবি বাল্মীকি প্রণীত 'রামায়ণম্' মহাকাব্যে রামের পিতৃভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য সর্বজনবিদিত; যদিও এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিককালের নারীমুক্তি আন্দোলনের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাদের মতে, রামচন্দ্র সেই রাজা, যে কিনা নিজ স্ত্রীকে জীবন্ত কবর দিয়েছিল। তাঁদের এরূপ যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলতে হয় যে, রামচন্দ্রকে পতিরূপে গ্রহণ করে সীতাদেবী স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী হওয়ায় সৌভাগ্য দীর্ঘদিন ভোগ করতে পারেননি-— একথা সত্য; কিন্তু এর কারণ— প্রথমত, রাম-সীতার বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই পিতৃসত্যপালনের জন্য রামের বনগমনের সিদ্ধান্ত ও সেই সঙ্গে সীতাদেবীর স্বেচ্ছায় স্বামীর পদাঙ্কানুসারিণী হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ; দ্বিতীয়ত, রাবণ-পত্নী মন্দোদরীর অভিশাপে সীতার অগ্নিপরীক্ষা; তৃতীয়ত, লোকাপবাদে প্রজানুরঞ্জক রাজা রামচন্দ্র কর্তৃক পঞ্চমাস গর্ভবতী সীতার নির্বাসন; চতুর্থত, সেই লোকাপবাদের কারণেই সীতার পাতাল প্রবেশ। সুতরাং এর দ্বারা সুস্পষ্ট যে, রামচন্দ্র সেই রাজা, যিনি কিনা প্রজাদের সুখের জন্য তাদের চাহিদা মেনে নিজের সুখস্বরূপিণী স্ত্রীকে বিসর্জন দিতেও পিছুপা হননি। কারণ রাজার ধর্ম প্রজার সুখ বিধান করা, নিজের ও নিজের পরিবারের সুখে কালাতিপাত করা নয়। সাম্প্রতিককালের অবক্ষয়ী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রামচন্দ্রের শিক্ষাই প্রতিটি রাষ্ট্রবিদের গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের সংস্কৃত আকর গ্রন্থসমূহ যেমন মানবিক মূল্যবোধ, নৈতিক শিক্ষা, নান্দনিক সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অবগত করায়; ঠিক তেমনি আমাদের এই প্রাচীন দেশের অমূল্য সংস্কৃতিও এই ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কুলপরিচয় ব্যতীত যেমন কোনো মানুষ শোভা পায়

না, তেমনভাবেই বর্তমান সময়ে আর্যভাষাভাষীরাও সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানহীন হয়ে শোভা পেতে পারে না। মানবেতিহাসের সম্যক অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম, এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সমালোচক ভিন্টারনিৎসের মত প্রণিধানযোগ্য— 'If we wish to learn to understand the beginning of our own Culture, if we wish to understand the oldest Indo-European Culture, we must go to India where the oldest literature of an Indo-European People is preserved.'

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, সংস্কৃত ভাষায় কেবল ধর্মগ্রন্থই রচিত হয়েছে এবং সেগুলি আমাদের উপনয়ন বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সংস্কার ও অন্যান্য নানাবিধ পূজা-পার্বণেই কার্যকর হয়; কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে তা নয়, ভাষা হলো ভাব-প্রকাশের মাধ্যম। তাই বর্তমানকালে যেমন ইংরেজি ভাষায় নানা প্রকার বিষয় লিপিবদ্ধ হয়, ঠিক সেরকম ভাবেই প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষাকে মাধ্যম করে বহু বিষয় (যেমন— আয়ুর্বেদশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, নৃত্যশাস্ত্র, শয়নশাস্ত্র, রন্ধনশাস্ত্র, ভোজনশাস্ত্র,অঙ্কনশাস্ত্র, মনস্তত্ত্বশাস্ত্র, বাক্‌পারুষ্যশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ঔষুধবিদ্যা, মুষ্টিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি প্রায়োগিক বিষয়সমূহ) রচিত হয়েছিল; যা সুপ্রাচীন ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাসের স্বাক্ষরবাহী। তাই সমগ্র ভারতবাসীর কাছে সংস্কৃত ভাষা হলো সুসংস্কারযুক্ত সাংস্কৃতিকী ভাষা এবং ভারতবাসীর আত্মস্বরূপ। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল— 'ভারতবর্ষের চিরকালের যে আত্মা, তার আশ্রয় সংস্কৃতভাষা'।

ভারতবর্ষের আত্মস্বরূপা সংস্কৃত ভাষা— একথা সর্বজনবিদিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে ভারতবর্ষে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব ও মর্যাদা হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হবে তথাকথিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের ভারে সংস্কৃতভাষাকে অকারণ দুরূহ করে তোলা। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকক্রমে একটি নমুনা তুলে ধরলাম— সংস্কৃত এমন একটি ভাষা, যা পৃথিবীর অধিকাংশ (প্রায় প্রতিটি) লিপিতেই প্রকাশ করা যায়। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত ভাষার কিন্তু নিজস্ব কোনো লিপি নেই। ভারতবর্ষে হিন্দীভাষী মানুষের আধিক্য থাকায় এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের মান্যবর প্রথম রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিশেষ অনুকম্পায় হিন্দীভাষাকে আমাদের দেশের সংযোগকারী ভাষা ঘোষণা করার কারণে প্রায় গোটা দেশ জুড়ে দেবনাগরী লিপিতে সংস্কৃতভাষা লেখার এক বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। যদিও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথিসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে নানা সময়ে নানা লিপিতে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গলিপিতে সংস্কৃত ভাষার প্রকাশ রীতিমতো অপরাধ বলেই মনে করেন পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর পণ্ডিতসমাজ। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত গবেষক কিংবা গবেষিকাদের গবেষণাপত্র হতে হবে সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপিতে অথবা ইংরেজি ভাষায়; কিন্তু যদি কোনো গবেষক বা গবেষিকা বঙ্গভাষায় সংস্কৃতের গবেষণাপত্র নির্মাণ করে স্থানে স্থানে বঙ্গলিপিতে সংস্কৃতভাষার উদ্ধৃতি লিপিবদ্ধ করেন, তাহলে তিনি তথাকথিত সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজের কাছে কখনোই নৈকষ্যকুলীন পণ্ডিত নন। এজন্য সংস্কৃতের গবেষক বা গবেষিকাদের সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপিতে অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত গবেষণাপত্র যখন গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তা তথাকথিত সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজে আদৃত হলেও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ পাঠক তার স্বাদ উপলব্ধিতে বঞ্চিত হয়ে যেই বলে ওঠেন— 'ওরে ব্বাবা! সংস্কৃত ভাষা! সে তো প্রচণ্ড কঠিন! ওর থেকে দূরে থাকাই ভালো'; অমনি তথাকথিত সেই পণ্ডিতগণ নিজেদের পাণ্ডিত্যে আহ্লাদে আটখানা হয়ে নিজেদের পিঠ নিজেরাই চাপড়ান; কিন্তু তাঁদের এরূপ বোধদর হয় না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজ সহজ, সরল, সাবলীলভাবে সর্বজনবোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে সবার সেবায় না লাগে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ সার্থকতা লাভে সমর্থ নয়। এবার আসা যাক অন্য প্রসঙ্গে— এই সংস্কৃত ভাষার মহত্ব অপ্রতিম। ভারতবর্ষের সংহতিরক্ষার উপায় হিসাবেও সর্বভারতীয় শিক্ষায় সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তন তথা এই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতিদান আজকের দিনে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশের প্রতি নাগরিকদের মমত্ববোধ যদি অকৃত্রিম হয় এবং আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, তাহলে দেশের সংহতি কখনো কারোর দ্বারাই ব্যাহত হয় না— একাজ সংস্কৃত ভাষান্তর্গত সুসংস্কারের মাধ্যমেই সাধন করা সম্ভব। শরীরের সঙ্গে রক্তকণিকার, তিলের সঙ্গে তৈলধারার এবং দুধের সঙ্গে মধুরতার যে নিত্য সম্বন্ধ; ভারতবর্ষের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও তদ্রূপ সম্বন্ধ। অতীতে এই দেবভাষা সংস্কৃত সর্বভারতীয়ের ভাবাভিব্যক্তিতে প্রাধান্য লাভ করে দেদীপ্যমান হয়েছিল— এই তথ্য বহু প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণেই সুস্পষ্ট। এখানেই শেষ নয়, সংস্কৃত শিক্ষার হাত ধরেই মানব মনে 'পরোপচিকীর্ষা', 'বসুধৈব কুটুম্বম্বকম্', 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ইত্যাদি জীবনদর্শন জাগ্রত হয়েছে। অতএব সংস্কৃত ভাষা যে গৌরবপূর্ণ— একথা সংশয়াতীত। সংস্কৃত ভাষার এই জাতীয় সংহতি রক্ষার সামর্থ্যকে অধিকার করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদ কে.এম. পণিক্কর মহোদয় মন্তব্য করেছেন— 'The unity of India will collapse if it ceases to be related to Sanskrit and breaks away from Sanskrit and Sanskrit Tradition.'

পরিশেষে বলতে হয় যে, সংস্কৃতভাষা প্রাচীন হয়েও চিরনতুন, প্রতি যুগে ও প্রতি জনে প্রকাশমান; ব্রহ্মশক্তির ন্যায় নিখিলার্থ সাধনে পটু, সকলপ্রকার বিতর্ককে অতিক্রম করে অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং আগামী দিনেও স্বমহিমায় দেদীপ্যমান থাকবে। এপ্রসঙ্গে পাশ্চাত্য-সমীক্ষক স্যার হোরেস্ হেম্যান উইলসন-এর মত উল্লেখযোগ্য—

'ন জানে বিদ্যতে কিং তন্মাধুর্যমত্র সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মাত্তা যেন বৈদেশিকা বয়ম্।।
যাবদ্ ভারতবর্ষং স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্যহিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্।।
অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোদুধিকম্।
দেনভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে।।

প্রাচ্য-সমালোচক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতও প্রণিধানযোগ্য—

'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব। সংস্কৃত ভাষায় একটা আনন্দ আছে। সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।' ■

চিঠিপত্র

রাজ্য সরকারের বিচক্ষণতা !

পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র দেশ বাংলাদেশের সরকার খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে নানা প্রকার অভিযান চালিয়ে অপরাধীদের দণ্ড দিতে কঠোর হস্তে আইন প্রয়োগ করছে।

আমাদের রাজ্যে ব্যবসায়ীগণ ঢালাওভাবে কারবাইড, ফরমালিন, রং ইত্যাদি বিষাক্ত রাসায়নিক খাদ্য বস্তুতে ব্যবহার করছে। আমাদের পৌরাণিক শিবঠাকুর বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন। আমাদের রাজ্য সরকার অপরাধীদের শাস্তি বিধানে না গিয়ে জনগণকে বিষপানে অভ্যস্ত করে শিবত্ব প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছে।

ব্যাপারটি আগে বুঝতে পারিনি বলে মনে বড়োই ক্ষোভ ছিল। এখন বুঝতে পেরে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টি লাভ করছি। এবং রাজ্য সরকারের বিচক্ষণতার ভূয়সী প্রশংসা করছি।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

পশ্চিমবঙ্গে অশুভ শক্তির আগমন

যা আশঙ্কা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত সেটাই হতে চলেছে। মমতার অরাজকতা ও জেহাদি তোষণের ফল যে ভয়ানক সেটা বুঝতে বাকি ছিল না।

মমতার টিএমসি নামক দলটা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে আর এই বঙ্গে আবার মাথাচাড়া দিতে চলেছে সেই মুসলিম লিগ অনুপ্রাণিত AIMIM (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen). AIMIM নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি যার ভাই বলেছিল ২ ঘণ্টা পুলিশ সরিয়ে দিলে ২০ কোটি মুসলমান ভারতবর্ষকে হিন্দুশূন্য করে ফেলবে। সেই আসাদুদ্দিন ওয়েইসির কলকাতায় আসার কথা ছিল ২৮ জুন।

মনে পড়ে যাচ্ছে আবার সেই ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ এর কথা। মুসলিম লিগের কুখ্যাত নেতা সুরাবর্দির নেতৃত্বে যেদিন হয়েছিল 'The Great Calcutta Killings.'

১৬ হাজার সনাতনী ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রাণ গেছিল সেদিন আর তারপর, আবার বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত নোয়াখালিতে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন হিন্দু নিধন আর সনাতনী ধর্মপ্রাণ মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছিল। এই অশুভ শক্তিকে যে কোনো ভাবেই আটকাতে হবে না হলে এর ফল চরম হতে চলেছে তাতে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

মমতা হয়তো তার গুটি কয়েক এমএলএ, এমপি নিয়ে ওই এআইএমআইএম-এর সঙ্গেই যোগদান করতে চলেছে নিজের অস্তিত্বকে বাঁচানোর জন্য, কিন্তু এই বঙ্গবাসীর অস্তিত্ব রক্ষা কে করবে?

এর জন্য সমাজকে এবং রাষ্ট্রবাদী মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই অশুভ শক্তির অবসান ঘটাই।

—জয়দেব মল্লিক,
নেতাজী সুভাষ নগর,
কলকাতা-১০০।

এরাজ্যে বিজেপির জয়ে একক কৃতিত্ব কারো নেই

গত ৩ জুন ২০১৯-এর স্বস্তিকায় অরুণাভ সেনগুপ্তের 'বিজেপির জয়ের নেপথ্য কারিগর' শীর্ষক লেখা পরিপ্রেক্ষিতে এই চিঠি। শ্রীসেনগুপ্ত ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ১৮টি আসন জয়ের পেছনের মূল কারিগর হিসেবে মুকুল রায়কে চিহ্নিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হলো, মুকুল রায় ২০১৭-তে বিজেপিতে যোগ দেন। তাঁর কথাকথিত 'অসম্ভব দক্ষ স্ট্র্যাটেজিস্ট' ভাবমূর্তি সত্ত্বেও ২০১৭ থেকে ২০১৯—এই দুই বছরে কিন্তু বিশেষ কোনো সাফল্য দেখাতে পারেননি। তিনি দল ভাঙাতে দক্ষ একথা আমরা জানি। তৃণমূলের হয়ে তিনি কংগ্রেস ও সিপিএম ভাঙানোতে সাফল্যও পেয়েছেন। কিন্তু বিজেপিতে আসার পরে তিনি তৃণমূল বা অন্যদল ভেঙে কোনো সিটিং এমপি বা এমএলএ প্রথমে আনতে পারেননি তাঁর তথাকথিত তৃণমূলের অন্দরের নকশার জ্ঞান সত্ত্বেও। এমনকী তাঁর নিজের পুত্রকেও প্রথমে বিজেপিতে আনতে পারেননি। গত কয়েক বছরে বিজেপির বিভিন্নস্তরের নেতা এবং নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নিরন্তর পরিশ্রমের ফলেই উনিশের এই সাফল্য। বিষয়টি কিছু উদাহরণ দিয়ে বললে পরিষ্কার হবে।

তৃণমূল থেকে আসা নিশীথ প্রামাণিক, অর্জুন সিংহ, সৌমিত্র খাঁ এই নির্বাচনে জিতেছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কুচবিহারে আগে থেকেই বিজেপির অবস্থা যথেষ্ট ভালো ছিল, ওখানকার উপনির্বাচনে বিজেপি আগেই দ্বিতীয় হয়েছিল আর তার পেছনে ছিল বিজেপির কার্যর্তাদের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। আর এর প্রচেষ্টার লাভের গুড় সদ্য আগত তৃণমূলি নিশীথ খেয়ে নিল। এতে মুকুল রায়ের কোনো ভূমিকা নেই। অর্জুন সিংহ বা সৌমিত্র খাঁ তৃণমূলের কাছ থেকে 'নমিনেশন' না পেয়ে শেষ মুহূর্তে তৃণমূল ছেড়েছে বিজেপির বাড়বাড়ন্ত দেখেই। মুকুল রায় না থাকলেও ওঁরা বিজেপিতে আসতেনই। এছাড়া তাঁদের কোনো বিকল্প ছিল না। সৌমিত্র খাঁ নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছেন মূলত তাঁর স্ত্রীর প্রচারের ফলে এবং বিজেপির ইতিবাচক হাওয়াতে। তৃণমূলত্যাগী অনুপম হাজরা নির্বাচনের জিততে পারেননি যাদবপুর থেকে। তাঁর ছেড়ে আসা বোলপুরেও বিজেপি জিততে পারেননি। অনুপমের আগের জেতা বোলপুরেও বিজেপিকে জেতাতে পারেনি আর নতুন আসন যাদবপুরেও অনুপমকে

জেতাতে পারেনি। যেখানে বিজেপির অবস্থা আগে থেকেই ভালো। এখন মোদীজী, অমিতজী ও দিলীপদার পরিশ্রমের ফলে আরও ভালো হয়েছে সেখানেই বিজেপি জিতেছে। আর সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নিরন্তর প্রয়াস। আমি মনে করি, এবারে বিজেপি দুটো আসনে প্রার্থীদের নিজের চেষ্টা কাজ করেছে— হুগলী ও ব্যারাকপুরে। অর্থাৎ, বিজেপির জয়ে মুকুল রায়ের প্রাধান্য তো দূরস্থান, কোনো উল্লেখ করার মতো ভূমিকাই ছিল না।

এখন বিজেপিতে অনেকে যে আসছেন তার কারণ মুকুল রায় নন, বিজেপির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি। অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সঙ্গে মুকুল রায়ের তুলনা করা বাতুলতা মাত্র। মুকুল রায় নির্বাচনের পরে থেকেই বলছেন, তৃণমুল থেকে লোক ভাঙিয়ে আনবেন, নির্বাচনের সেটা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। তবেই হ্যাঁ, মুখ্য না হলেও তিনি বিজেপির ভবিষ্যৎ সাফল্যের কিছুটাও কারিগর। ভাঙনের নয়, সংগঠন তৈরি করতে গেলে গড়ার কারিগর হতে হয়। অন্যথায় বেনোজল ঢোকানোর ভগ্নদূত হিসেবেই পরিচিতি পাবেন।

—**হরলাল রায়,**
গোলাপবাগ, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

সোনা খাঁটি প্রমাণ হয় কষ্টিপাথরে

কথাটি অবশ্য সবারই জানা। স্বর্ণকারদের কষ্টিপাথরে সোনা যাচাইয়ের একটি রীতি আছে। সোনাটি নিখাদ বা নির্ভেজাল কিনা এটার মাধ্যমে প্রমাণ হয়। তেমনি কাউকে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী প্রমাণ করতে গেলে তাকে অবশ্যই কিছু নিয়মের অধীন থাকতে হয়। কাউকে কোনোদিন বিজেপির মিছিলে দেখা গেল না, বিজেপির লোকদের সঙ্গে কোনোদিন কথাই হলো না, তাকে কোনোদিন আরএসএসের শাখায় দেখা গেল না। আর সুযোগ বুঝেই শাখায় যেতে শুরু করল। বিজেপি লোকদের কাছে বড়ো বড়ো বার্তা দিতে শুরু করলো। পুরনো লোকদের পেছনে ফেলে লাইনের আগের সারিতে দেখা গেল। এটা কি প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মানসিকতা। ডুবন্ত নৌকার আরোহীকে বাঁচানো সব মানুষেরই কর্তব্য। কিন্তু তাই বলে জল থেকে উঠেই নৌকার হাল ধরবে সেটা কেউ মানতে পারে না। সে জীবন রক্ষার তাগিদে নৌকায় আশ্রয় নিতে পারে, তাই বলে পাল তোলার দায়িত্ব তার অধিকারে পড়ে না।

যারা আগে থেকে নৌকার দেখভাল করছে তারা নতুন লোককে কখনোই মাঝির দায়িত্ব দেবে না। বাঁচার তাগিদে অন্য নৌকায় উঠলে তাকে আগে ভিজা পোশাক পাল্টাতে হবে সেই নৌকায় আগের সব যাত্রীদের ধরন-ধারণ সব কিছু বুঝে নিতে হবে তবেই ক্ষমতা গুণে যাত্রী থেকে মাঝির দায়িত্ব পাবে। কোনো কিছুতে ঢোকার আগে একটা কথা মানতে হবে রোম ওয়াজ নট বিল্ট ইন এ ডে।

—**স্বপন কুমার ভৌমিক,**
শান্তিপুর।

প্রশান্ত কিশোর কি মমতাকে ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারবেন?

প্রশান্ত কিশোরকে ভাড়া করে এনে লোকসভা নির্বাচনে বেশ ভালোভাবে হেরে যাবার কষ্ট মুছে দিতে মরিয়া মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু হারের যন্ত্রণাতে ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার চেহারাকে ঢাকতে আরও বেশি মরিয়া। একটি বাজারি পত্রিকা ও তার জনৈক সাংবাদিক যিনি লিখতে পারেন মমতার সর্বাত্মক যুদ্ধে 'প্রশান্ত কিশোর ঘুঁটি মাত্র'। কিন্তু ওই যে মিথ্যার জাল বোনাই যাদের কাজ তারা খেয়ালও রাখে না যে কত বড়ো স্ববিরোধিতা তাদের লেখায় ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে পেশাদার ইলেকশন স্ট্র্যাটেজিস্ট প্রশান্ত কিশোরকে ডেকে নাকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বিষয় খুব স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে পিছু হঠার নাকি কোনো প্রশ্নই নেই।

প্রশ্ন হলো, বিজেপিকে ঘিরে ফেলবার সব আয়োজন কি মমতা ব্যানার্জি করছেন, নাকি বাজারি পত্রিকাটি করছে? প্রশান্ত কিশোরকে ডেকে এনে যে তার পুরো বে-আব্রু হওয়াটা কিছুটা ঢাকতে চেয়েছে তার স্বপ্নের নেত্রী, সেটাকেই কিছুটা আড়াল করতে চায় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ধনী পত্রিকা গোষ্ঠীটি। মমতা ব্যানার্জির রাজনৈতিক পদক্ষেপের পুরোটাই যে স্ববিরোধিতা এবং মিথ্যাচারের পঙ্কিলতায় ডুবে থাকে, সেটার উপর কিছুটা সুগন্ধী পারফিউম ছড়াতে গিয়েছেন সেই সাংবাদিক। কিন্তু সুগন্ধী ছড়ালেই কি আর পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকা যায়। লক্ষণীয় নর্দমার পচা পাঁক কিংবা শবদেহের পচা গন্ধকে তাদের লেখনী দিয়ে ঢাকবার কাজই তো সেই পত্রিকাটি গোষ্ঠী বিগত পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে করে গিয়েছে।

'প্রশান্ত কিশোর নাকি কিছুই না, সামান্য একটা ঘুঁটি মাত্র।' সামান্য যদি ঘুঁটি তিনি হবেন, তাহলে অতীতের চেয়েও অনেক বেশি টাকায় ভাড়া করে প্রশান্ত কিশোরকে তাদের নেত্রী নিয়ে এলেন কেন? নেত্রীর মুখের নোংরা ভাষা শুনে, পশ্চিমবঙ্গের আমজনতা তো পালিয়েছে, অন্যান্য আঞ্চলিক নেতারাও তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বাকি থাকল এক প্রশান্ত কিশোর। এই খড়কুটোকে আশ্রয় করে যদি কিছু করা যায়।

আরেকটা সাধারণ প্রশ্নও থাকে, নেত্রীর মুখনিঃসৃত বাণীকে যদি বিশ্বাস করতেই হয়, যেমন আই ডোন্ট কেয়ার ফর দি চেয়ার (পাঠক লক্ষ্য করুন, এটাও কিন্তু একটা উচ্চমানের কবিতা), তাহলেই বা বিপুল টাকা খরচ করে প্রশান্ত কিশোরের শরণাপন্ন হলেন কেন নেত্রী? ডোন্ট কেয়ার ফর দি চেয়ার! কী অসাধারণ কবিতা। তবে রাজীব কুমারকে নিয়ে এরকম কবিতা এখনও লেখা হয়নি!

—**শুভ্র সান্যাল,**
ইংরেজবাজার, মালদহ।

পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় মহিলারা

সুতপা বসাক ভড়

আজ আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের মাতৃশক্তি কেবলমাত্র সংসারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আজ তাঁরা কুশলতার সঙ্গে তাঁদের কার্যদক্ষতার পরিচয় রাখছেন। অনেক ক্ষেত্র অতীতে কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, ধীরে ধীরে মহিলা ক্ষমতায়ণের পথে চলতে চলতে আজ এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যা মহিলাদের অচ্ছ্যুৎ। সর্বক্ষেত্রে মহিলারা নিজেদের প্রমাণ করেছেন এবং স্বভাবগত কোমলতা ও কঠোরতার মিশ্রণে অনেক কঠিন স্থিতির অতি সহজ সমাধান করে চলেছেন। সেজন্য বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্ব দেন। বর্তমান স্থিতিকে সুচিন্তিত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার সহজাত ক্ষমতা মহিলাদের মধ্যে আছে। এছাড়া ভবিষ্যতের জন্যও তাঁরা চিন্তাশীল এবং সেজন্য সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। সংসারে সন্তানাদির ভবিষ্যৎকে মঙ্গলময় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সমাজ এবং দেশের কথা ভেবে এমন কিছু সাহসী পদক্ষেপ নেন, যা আমাদের বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ করে তোলে। যেমন ছত্তিশগড়ের জশপুরে মহিলা স্বয়ং সহায়তা কেন্দ্রসমূহ ২০ একর জমিতে চা-বাগান বানিয়ে ফেলেছেন।

খারুডিহির চা, আজ এই নামের চা অতটা বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই চা খুবই ভালোবেসে খাব। এর কারণ হলো ছত্তিশগড়ের যে জায়গায় এই চা পাতার চাষ করা হচ্ছে, তা উৎকৃষ্ট চা তৈরির জন্য অতি উত্তম। এখানকার আবহাওয়া, উচ্চতা, বাতাবরণ সবকিছু চা-চাষের অনুকূল। দ্বিতীয়ত, এই চা-বাগান মহিলা স্বয়ং সহায়তা কেন্দ্রসমূহ দ্বারা বানানো এবং তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা এই চা-বাগান তৈরি। এই কাজে বনবিভাগ তাঁদের উৎসাহিত করেছে। প্রায় ১.৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে চা বাগানে।

বর্তমানে প্রায় ২০০ কিলো চা-পাতা প্রতি সপ্তাহে এই বাগান থেকে তোলা হয়। এপ্রিল থেকে চা-পাতা তোলার কাজ শুরু হয়ে যায়। জ্যোতি বরুয়া, কান্তী বরুয়া, মই তির্কী, ইল্লা অলেফান্স, বিমলা ইরা এরা সবাই এইসব কেন্দ্রের সদস্যা। মোট ২০ একর জমিতে তৈরি এই চা-বাগান আগামী ১০০ বছর পর্যন্ত মহিলাদের এবং তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে স্থায়ী রোজগার দেবে। বনবিভাগ থেকে খারুডিহি ব্র্যান্ডের চা বেশ কয়েকটি Tea-outlet-এ রাখার ব্যবস্থা করেছে। খুব শীঘ্রই সমগ্র দেশের জনসাধারণের কাছে খারুডিহির চা নিজস্ব স্বাদ নিয়ে আসবে।

বনবিভাগের বিশেষজ্ঞদের মতে, জশপুরের আশেপাশে ১০-১২ বর্গকিলোমিটার ক্ষেত্রফলের বাতাবরণ চা-চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। এখানে চা-চাষের জন্য যতটা বৃষ্টির প্রয়োজন, ঠিক ততটাই হয়। খারুডিহিতে কোথাও বৃষ্টির জল জমে না। তাপমাত্রাও মোটামুটি ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

এক একর জমিতে ধান চাষ করলে কৃষকদের আয় হয় ১০-১৫ হাজার টাকা, অথচ ওই জমিতে চায়ের চাষ করলে ১.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগারের সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে একবার যদি চা-গাছ নিজস্ব আকারে এসে যায়, তবে আগামী ১০০ বছর শুধু পাতা-তোলার কাজ থাকবে। এছাড়া আর কোনো খরচা নেই। বনবিভাগ খারুডিহিতে চায়ের প্রসেসিং প্ল্যান্ট বসাতে চলেছে। এখনও পর্যন্ত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই চা-চাষের ফলাফল খুবই সন্তোষজনক। একে সামনে রেখে আশেপাশের গ্রামের কৃষকদেরও চা-চাষের জন্য জাগরুক করা হচ্ছে।

মারুডিহির চা-এর প্রজেক্ট প্রভারী পঙ্কজ রাজপুত্রের মতে খারুডিহির চা-গাছগুলি ২৪ থেকে ২৬ ইঞ্চি পর্যন্ত বড়ো হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে ১৫০-২০০ কিলো পর্যন্ত পাতা তোলা হয়। এই ভাবে স্থানীয় বাজারে খুব ভালো বিক্রি হচ্ছে। শীঘ্রই এই উৎপাদন ২০ থেকে ২৫ গুণ বেশি হতে চলেছে। তখন সমগ্র দেশে খারুডিহি ব্র্যান্ডের চা উপলব্ধ হবে। খারুডিহির স্থানীয় মহিলারা চা-শিল্পের মতো একটি শিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের ফলও আজ তাঁরা পাচ্ছেন। তাঁদের তৈরি চা-বাগান বর্তমানে ওই এলাকায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ও অন্যান্যদেরও পথপ্রদর্শক হয়েছে। এদের উদ্যোগ ও সক্রিয়তা অন্যান্যদেরও উৎসাহিত করে চলেছে। নিজেদের স্বনির্ভরতার সঙ্গে আগামী ১০০ বছর পর্যন্ত উপার্জনের কর্মক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন এই দূরদর্শিনী মহিলারা। ■

ফুসফুসের ক্যান্সার ও হোমিওপ্যাথি

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

পরিসংখ্যানে জানা গেছে, ৮০ শতাংশ ফুসফুসের ক্যান্সারের রোগীই ধূমপানের শিকার। ফুসফুসের শ্বাস নালী, বায়ুথলি ও মিউকাস গ্ল্যান্ডে এপিথেলিয়াম কোষ থেকে সৃষ্ট ক্যান্সার হলো ফুসফুসের ক্যান্সার বা ব্রংকোজেনিক কারসিনোমা। বিশ্বব্যাপী পুরুষের মৃত্যুর প্রথম কারণ ফুসফুসের ক্যান্সার, আর নারীদের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয় কারণ। এই রোগ গ্রামের চেয়ে শহরবাসীর বেশি হয়। পরিসংখ্যানে জানা গেছে ৮০ শতাংশ ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীই ধূমপানের শিকার।

কারণ : পরিবেশগত কারণ ও লাইফস্টাইল সম্পর্কিত বেশ কিছু কারণে ফুসফুস ক্যান্সারের উৎপত্তি হয়। ফুসফুস ক্যান্সারের কারণগুলো হলো—

ধূমপান : ফুসফুস ক্যান্সারের জন্য ধূমপান হলো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কারণ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান দুটিই ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করে। ফুসফুসের সব ধরনের ক্যান্সার রোগীর ৯০ শতাংশ ধূমপায়ী। আর ৫ শতাংশ পরোক্ষ ধূমপায়ী ক্যান্সারে ভোগে। দিনে ২০টি করে ৪০ বছর সিগারেট খেলে ফুসফুরে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা, অধূমপায়ীর তুলনায় ২০ গুণ বেশি হয়। ধূমপান ত্যাগ করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে যায়। অনুর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সে ধূমপান ত্যাগে ভালো সুফল পাওয়া যায়।

বায়ুদূষণ : অজৈব পদার্থের ক্ষুদ্র কণা বা আঁশ যেমন এসবেস্টস, নিকেল, ক্রোমিয়াম এবং জৈব পদার্থ যেমন--- বেনজিন, বেনজোপাইরিন বায়ুর সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করে ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তা : ক্যান্সার চিকিৎসায় যে রেডিওথেরাপি দেওয়া হয়, তার তেজস্ক্রিয়তায় ক্যান্সারে রোগী দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারে। বায়ুতে রোডন নামের গ্যাসেও তেজস্ক্রিয়তা থাকে। এটি ধূমপানের পরে ফুসফুসে ক্যান্সারের অন্যতম কারণ।

খাদ্যাভ্যাস : অতিরিক্ত চর্বি ও কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার এই ক্যান্সারের জন্য দায়ী।

অন্যান্য রোগ : সিওপিডি, যক্ষ্মা, সিলিকসিস, আইএলডি, রোগগুলোতে ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। জেনেটিক বা বংশগত ফুসফুসের ক্যান্সার রোগীর আত্মীয়ের ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ। ধারণা করা হয়, ক্যান্সার রোগের উৎপত্তিতে বংশগত প্রভাব বিদ্যমান।

লক্ষণ : নানা রকমের লক্ষণ আছে, যা দেখে কিছুটা ক্যান্সার শনাক্ত করা যায়। যেমন ৫০-৭০ শতাংশ রোগীরই কাশি হয়, বিশেষ করে শুষ্ক কাশি। কোনো ধূমপায়ীর দীর্ঘমেয়াদী কাশি হলে ক্যান্সার সন্দেহ করা উচিত। ২০-৫০ শতাংশ রোগীর কাশির সঙ্গে রক্তে যায়। রক্তের পরিমাণ বেশি হলে শ্বাসনালী বন্ধ হয়ে রোগীর দেহে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, যাকে বলে 'এসফাইক্সিয়া'। বুকের মাঝখানে (ক্যান্সার আক্রান্ত স্থানে) মৃদু ব্যথা হয়।

চিকিৎসা : ফুসফুসে ক্যান্সার কোনো জীবাণুঘটিত রোগ নয়। বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি থাকলেও এ রোগ থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের কোনো চিকিৎসাপদ্ধতি এখনো আবিষ্কার হয়নি। যদিও প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ শুরু করলে মোটামুটি আরোগ্য লাভ করা সম্ভব।

সাধারণ ব্যবস্থা : প্রথম কাজ হলো রোগীকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবার দেওয়া, ধূমপান বর্জনে যথাযথ চিকিৎসা প্রদানসহ অন্যান্য রোগের যথাযথ চিকিৎসা করা। সার্জারি, রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি সাধারণ ফুসফুস ক্যান্সারের তিন ধরনের চিকিৎসা রয়েছে। ক্যান্সারের হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল শ্রেণীও পর্যায়ের ওপর চিকিৎসার ধরণ নির্ভর করে।

সার্জারি : স্কোয়ামাস ও অন্যান্য ননস্মল সেল ক্যান্সারে প্রাথমিক পর্যায়ে সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসায় ভালো ফল পাওয়া যায়।

রেডিওথেরাপি : স্কোয়ামাস ও অন্যান্য ননস্মল সেল ক্যান্সার যদি সার্জারির আরোগ্য হয় এছাড়া অতিরিক্ত রক্তকাশি, তীব্র হাড় ব্যথা, সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা শিরায় বাধা এসবের উপশমে রেডিওথেরাপি বেশ কার্যকর।

কেমোথেরাপি : স্মল সেল ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা কেমোথেরাপি। এর সঙ্গে রেডিওথেরাপি চিকিৎসা যুক্ত হয়। এছাড়া ননস্মল ক্যান্সারেও সার্জারির আগে কেমোথেরাপি দেওয়া হয়।

প্রতিরোধ করণীয় : সঠিক খখাদ্যাভাস গড়ে তোলা। খাবারের মেন্যুতে তাজা ফলমূল ও শাক-সবজি নিয়মিত রাখা। ফুসফুসের ক্যান্সার প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ধূমপান না করা। অধূমপায়ীরাও একেবারেই বিপদমুক্ত নয়। শিল্পকারখানা ও গাড়ির নির্গত কালো ধোঁয়াও ফুসফুসে ক্যান্সারের জন্য দায়ী। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন—ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, অ্যাসবেস্টস ইত্যাদি এড়িয়ে চলা। ফুসফুসে ক্যান্সার সৃষ্টিতে অ্যাসবেস্টসের প্রভাব এত বেশি যে সমসাময়িককালে জাহাজশিল্পে অ্যাসবেস্টসের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফুসফুসে প্রদাহজনিত রোগ যেমন— যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া ভালো হওয়ার পর ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। তাই যথাসম্ভব সতর্ক থাকা।

৫০ বছরের বেশি বয়সি ব্যক্তি যদি ৩০ বছরের বেশি প্রতিদিন ২০ টির বেশি সিগারেটের ধূমপান করে, তাদের ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য স্কিনিং করা উচিত। এভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটি ধরা পড়লে চিকিৎসা দিয়ে মৃত্যুহার কমানো যায়। ■

৩৭০ ধারা বিলোপের পক্ষে অমিত শাহের বক্তব্য কুর্নিশযোগ্য

অভিমন্যু গুহ

সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের দাবি, কেবল সাম্প্রতিককালেই বিজেপির তোলা ইস্যু নয়। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মানুষ এই দাবি তুলে আসছেন। সম্প্রতি লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের এই মনের কথাই তুলে ধরেছেন। বিরোধীদের দাবি ছিল জম্মু-কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সমদৃষ্টিতে দেখলে চলবে না, কারণ সংবিধানের ৩৭০ ধারা বলে এই রাজ্যটি বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা পায়। প্রত্যুত্তরে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন সংবিধানের এই ধারাটি 'সাময়িক', 'স্থায়ী' নয়। শাহের এই বক্তব্যকে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা স্বাগত জানিয়েছেন।

ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বি. আর. আম্বেদকর সংবিধানের ৩৭০ ধারার খসড়া তৈরি করতে অস্বীকার করেন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরি নেতা শেখ আবদুল্লাকে পরামর্শ দেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী আম্বেদকরের সঙ্গে কথা বলে এমন সুবিধে যুক্ত কোনও আইন তৈরি করতে যা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। পরে ৩৭০ ধারার খসড়া তৈরি করেন গোপাল স্বামী আয়েঙ্গার। এই ৩৭০ ধারার প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল যে এই ধারাটি জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এরই বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, চক্রান্তকারী ছিলেন ওই শেখ আবদুল্লা।

শুধু জম্মু-কাশ্মীর নয়, ব্রিটিশরা ভারত ত্যাগের সময় অনেক 'প্রিন্সলি স্টেট'ই ভারতে যোগ দিয়ে ভারতের সংবিধানকেই মেনে নিয়েছিল। তাহলে জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো কেন? এমনিতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর অপরিণামদর্শিতায়

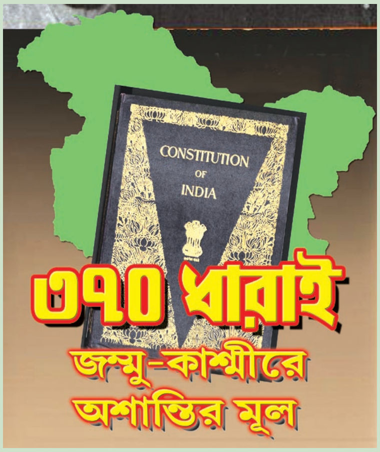

খণ্ডিত জম্মু-কাশ্মীরের অধিকার ভারত পেয়েছিল। কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও মর্যাদা দেয়নি ক্ষমতালোলুপরা। তাই ৩৭০ ধারা নামক একটি সাংবিধানিক গাজর নাকের ডগায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, যতই গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল, অখণ্ড ভারতের দিকে দৌড়নো যাক না কেন তা অধরাই থেকে যাবে।

সংবিধানের একুশতম অংশ যেখানে ৩৭০ ধারার খসড়া রয়েছে তাতে এটিকে সাময়িক (টেম্পোরারি), পরিবর্তনশীল (ট্রানজিশনাল) ও বিশেষভাবে অস্থায়ী (স্পেশাল প্রভিশনাল) বলে বর্ণনা করা রয়েছে। এই ধারার বলে জম্মু-কাশ্মীর দীর্ঘদিন ধরে 'স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য'-এর মর্যাদা পেয়ে আসছে। ফলে সাংবিধানিকভাবে ভারতের নিয়ন্ত্রণ জম্মু-কাশ্মীরে কায়েম না হওয়ার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, ভারত বিরোধিতা সেখানে জাঁকিয়ে বসেছে, কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের বিতাড়নের মতো ঘটনা ঘটছে। ভারতের আর্থিক সমৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একদিকে কাশ্মীরে ভারতবিরোধীরা অর্থনৈতিক ফায়দা লুটছে, অন্যদিকে পাকিস্তান ও চীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। আর এর মূলে রয়েছে সংবিধানের ৩৭০ ধারা।

হুরিয়ত কনফারেন্সের মতো মধ্যস্থতাকারী গোষ্ঠীগুলি আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি। ৩৭০ ধারা এদের বলীয়ান করেছে। একদিকে আলোচনার টেবিলে ভারতে নিয়ে যেতে অন্যদিকে ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের বুকে পাক-সন্ত্রাস অব্যাহত রাখারও পথ খুলে দিতে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে, ১৯৫৬ সালে বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যগুলি যখন সংবিধানের ২৩৮ ধারা বিলোপের মধ্য দিয়ে পুনর্গঠিত হয়ে দেশের সংবিধানকেই মেনে নিল, জম্মু-কাশ্মীর কিন্তু ৩৭০ ধারার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। দেশের অখণ্ডতার পক্ষে এই প্রবণতা ভয়ংকর।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে জম্মু-কাশ্মীরে দেশের সাংবিধানিক বিধি কায়েম করতে, 'এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'-এর নীতিকে কার্যকর করতে ৩৭০ ধারার অন্তরায়কে অপসৃত করাটা খুবই জরুরি এবং সেই দৃঢ়তার কথাই ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন। লোকসভায় জম্মু-কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধন) বিল, ২০১৯ এনে ওই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনকে আরও ছ'মাস বর্ধিত করেছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্র যে গণতান্ত্রিক, মুক্ত ও ভয়শূন্য পরিবেশে সেখানকার মানুষকে গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের সুযোগ করে দিতে বদ্ধপরিকর, অমিত শাহ তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

নেহরুর ভুলে গলায় কাঁটার মতো আটকে থাকা কাশ্মীর ভারতের প্রতিরক্ষা বা বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেই কেবল সমস্যা-জর্জর নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক। তাই যতক্ষণ ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত না করে জম্মু-কাশ্মীরে ভারতীয় মূলস্রোতের সাংবিধানিক ধারা যতক্ষণ না কায়েম হবে ততদিন কাশ্মীর গলার কাঁটা হয়েই থাকবে।

কাশ্মীরের ‘বিশেষ সুবিধা আইন’ বাতিলই ভারতকে এনে দেবে পূর্ণ স্বাধীনতা

সুজিত রায়

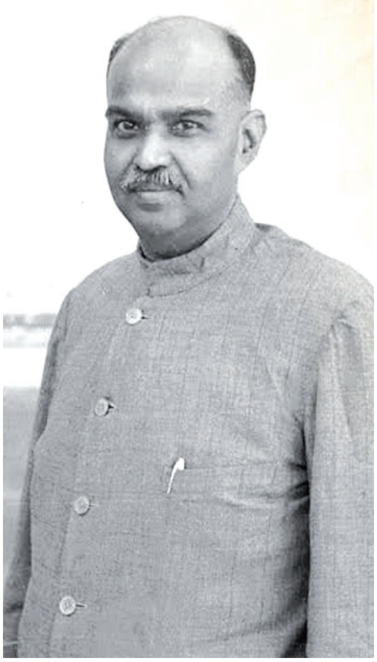

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, জম্মু ও কাশ্মীরের দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের পক্ষ থেকে একটা ভুল তথ্য প্রচার করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে যে, ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং আজকের ভারতীয় জনতা পার্টির আদিপুরুষ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ সাংবিধানিক আইনবলে সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন। এমন কথাও প্রচার করা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীন সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভার শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে ড. মুখোপাধ্যায় ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরে ‘স্পেশাল স্ট্যাটাস’ বলবৎ করার ক্ষেত্রে অন্যতম অগ্রণী এবং বল্লভভাই প্যাটেল, শেখ মহম্মদ আবদুল্লা, আফজল বেগ, মতিরাম বেগদার মতো তৎকালীন সময়ের আলোচক এবং সহিকারকদের অন্যতম। কিন্তু ন্যাশানাল কনফারেন্সের এই বিবৃতি পুরোপুরি সঠিক নয় এবং সত্য যা তা হলো জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ সাংবিধানিক আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন সবচেয়ে কট্টর সমালোচক এবং তিনিই প্রথম বলেছিলেন, একই রাষ্ট্রের অধীনে দুটি রাষ্ট্র এবং দুটি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারেন না। তিনি একথাও বলেছিলেন, হিন্দু অথবা মুসলমান— সবাই ভারতবর্ষের নাগরিক সুতরাং সেক্ষেত্রেও বিশেষ আইনবলে একটি প্রদেশের একাংশকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দেওয়াটা শুধু বেআইনি নয়, অনুচিতও। ইতিহাসকে ভুলে গেলে চলবে না যে কাশ্মীর ছাড়া অন্যান্য প্রদেশের নাগরিকদের কাশ্মীরে প্রবেশের আগে বিশেষ অনুমতি নেওয়ার জন্য জওহরলাল নেহরু যে আইন প্রবর্তন করেছিলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ই প্রথম তার বিরোধিতা করেন এবং অনুমতি ছাড়াই কাশ্মীরে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার হন। সেখানেই লোকচক্ষুর অন্তরালে পাহাড়ি জঙ্গলে একটি কুটিরে তাঁকে আটকে রাখা হয় এবং কাশ্মীরেই রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয় তাঁর।

একথা পরিষ্কার হওয়া দরকার--- জম্মু-কাশ্মীরের জন্য বিশেষ আইনে সম্মতিপ্রদানকারীদের মধ্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্মতি দিয়েছিলেন তখনই যখন আইনটিকে ‘সাময়িকভাবে বলবৎযোগ্য’ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সংবিধানের ২১ ভাগে ‘অস্থায়ী, অন্তর্বর্তীকালীন ও বিশেষ বিধানসমূহ’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে স্পষ্টতই উল্লেখ করো হয়েছে যে— তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে আইনটি সাময়িকভাবে ও অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকী সে সময় স্বয়ং জওহরলাল নেহরুও সরকারিভাবে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, জম্মু ও কাশ্মীরের ‘স্পেশাল স্ট্যাটাস’ সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে (Special status of Jammu & Kashmir would fade away with time)।

এখন স্বাধীনতাপ্রাপ্তির ৭৩ বছর পরেও কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স কাশ্মীর নামক রাজনৈতিক ইস্যুটিকে জিইয়ে রাখার তাগিদে এবং মুসলমান ভোটব্যাঙ্ককে নিজেদের পক্ষে অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫এ ধারা দুটিকে নিজেদের সুবিধামতো ব্যবহার করছে। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন আদ্যোপান্ত একজন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক নেতা। তিনি মনে করতেন হিন্দু অথবা মুসলমান, জৈন অথবা খ্রিস্টান— সকলেই ভারতীয়। সুতরাং সকলকে জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয়তাবাদকে মূল্য দিতে হবে। আগে দেশ, পরে ধর্ম। তাঁর সেই তত্ত্বভাবনা থেকেই আজ যখন ভারতীয়

জনতা পার্টি— 'এক দেশ এক জাতি' তত্ত্বের প্রয়োগে পদক্ষেপ নিতে চলেছে, তখনই শুরু হয়ে গেছে রাজনৈতিক শোরগোল। এমনকী সম্পর্ণভাবে সংকীর্ণ সংখ্যালঘু তত্ত্বে বিশ্বাসী পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি আরও এককাঠি এগিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করেছেন যে— 'Any tampering of Artical 370 and 35A will render treaty of accession null and void– অর্থাৎ সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫এ ধার দুটিকে বাতিল করা মানে কাশ্মীরের ভারতে অন্তর্ভুক্তিকরণকেই অস্বীকার করা। অর্থাৎ পরিষ্কার ভাবে তিনি যা করতে চাইছেন তা হলো— ভারত থেকে কাশ্মীরের বিচ্ছেদকরণ। কারণ তাঁর বক্তব্য— স্বাধীনতার সময় জম্মু এবং কাশ্মীরই ছিল একমাত্র মুসলমান-প্রধান রাজ্য যেটি পাকিস্তানের বিরোধিতা করে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তিনি একবারও স্বীকার করছেন না— সে সময় কাশ্মীর ছিল হিন্দুরাজের অধীনস্থ রাজ্য।

এখন প্রশ্ন হলো— বিজেপি ঠিক কি চাইছে! বিজেপির প্রাথমিক উদ্দেশ্য— দেশজুড়ে 'জাতীয়তাবাদ' অবিচ্ছেদ্য রাখা। ৩৭০ ধারা ও ৩৫এ ধারা কখনই জাতীয়তাবাদের পরিচায়ক নয়। বিজেপি চাইছে কাশ্মীর ভারতবর্ষের অন্যতম রাজ্য হিসেবে গোটা দেশের এক আইনের ধারায় এসে ভারতবর্ষের মূলস্রোতের অঙ্গীভূত হয়ে উঠুক। শুধু তাই নয়— এই দুটি আইনের জন্য কাশ্মীরের সার্বিক উন্নয়নের গতি অনেক সময়েই রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণ একটি আইনে যখন একটি রাজ্যকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় তখন দেশের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পের অনেক কিছুই ওইসব রাজ্যে প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না। দ্বিতীয়ত, ৩৫এ ধারা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরে অন্য কোনো রাজ্যের নাগরিকরা ভূসম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন না। এমনকী ভিন রাজ্যের কোনও মেয়ে কাশ্মীরের কোনো যুবককে বিয়ে করে সংসার পাতলেও তিনি শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির অধিকারী হতে পারেন না। তিনি নিজ অর্থে নতুন সম্পত্তি কিনতেও পারেন না। বাইরের কোনো শিল্পপতি কাশ্মীরে শিল্প স্থাপনও করতে পারেন না— আইনটির পরিধি এতটাই বিস্তৃত। আরও বড়ো প্রশ্ন হলো— কাশ্মীরে হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারগুলিকে তাদের দেশে বাস করার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মুসলমান আগ্রাসন ও অত্যাচারের শিকার হয়ে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। আজও তারা ভারতবর্ষে আশ্রিত হিসেবেই বসবাস করছেন। তাঁদের নিজ বাসভূমি পুনঃস্থাপন করাই হলো বিজেপির অন্যতম উদ্দেশ্য। তার ফলে কাশ্মীরকেও অদূর ভবিষ্যতে মুসলমান রাজ্যের তকমা বহন করতে হবে না। এক দেশ এক জাতি একতার সূত্রে বাঁধা পড়বে গোটা ভারতবর্ষ। এর চেয়ে বড়ো স্বাধীনতা আর কি হতে পারে? সুতরাং সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বিতর্ক ছেড়ে কাশ্মীরের রাজনৈতিক দল ও আপামর নাগরিকদের উচিত নতুন কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিলে গৃহীত উদ্যোগকে স্বাগত জানানো। যেদিন বিনা রক্তপাতে এ কার্য সমাধা সম্ভব হবে— সেদিনই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটবে। ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ পাবে পূর্ণ স্বাধীনতা।

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana (NR) ®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

কাশ্মীরকে বিশেষ সুবিধা যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতির বিরোধী

DELHI EDITION
The
LARGEST CIRCUL
KASHMIR
PLEBISCITE SOON
RULER'S DEC
Troops And Arms Flown To Srinagar
SHEIKH ABDUL
FORM INTERIM
UNION TROOPS RUSH
PROTECTION OF
26 October, 19

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা অনুচ্ছেদটা নিয়ে সম্প্রতি বেশ একটা বিতর্ক ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টা যেমন জটিল, তেমনি বিভ্রান্তিকর। বলা বাহুল্য, দেশের কিছু নেতার ভ্রান্তি, অদূরদর্শিতা এবং দুর্বলতার কারণে এই ব্যাপারে একটা দীর্ঘকালীন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ পর্বে যখন ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের ব্যাপারটা অনিবার্য হয়ে উঠেছে, তখন রাজনৈতিক দিক থেকে দেশের দুটো অংশ ছিল— 'ব্রিটিশ ভারত' ও 'প্রিন্সলি স্টেটস্'। ব্রিটিশ ভারত ছিল ইংরেজদের প্রত্যক্ষ শাসনে। কিন্তু তখন দেশে ৫৬২টা বিভিন্ন আকারের দেশীয় রাজ্য ছিল সাধারণত ব্রিটিশ শাসকরা ওই সব রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন না। স্বাধীনতার বিষয়ে যখন বৈঠকি রাজনীতি চলছে, তখন প্রশ্ন উঠল— ব্রিটিশ শাসকদের অবর্তমানে ওই সব দেশীয় রাজ্যগুলোর অবস্থান কেমন হবে, কারণ বিদেশি 'প্যারামাউন্টলি' আর থাকবে না।

১৯৪৭ সালের 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট' এর সমাধানের পথ দেখিয়েছে। বলা হয়েছে— দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসকরা 'ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন'-এ স্বাক্ষর দিয়ে ভারত বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন— তবে ইচ্ছে করলে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবেও থাকতে বাধা নেই। সেই অনুসারে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগ দিয়েছে, কোনো কোনোটা আবার গেছে পাকিস্তানে। কাশ্মীরের অবস্থাটা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের। রাজা হরি সিংহ ছিলেন হিন্দু, কিন্তু প্রজাদের অধিকাংশই মুসলমান। সম্ভবত গরিষ্ঠরা পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকেছিলেন, কিন্তু রাজা হরি সিংহ কোনও ডোমিনিয়নে যোগ না দিয়ে স্বাধীন ভাবে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু ইতিহাসের লিখন অন্য রকম। ২২ অক্টোবর (১৯৪৭) পাকিস্তানের কিছু সৈন্য হানাদারের ছদ্মবেশে হঠাৎ কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে এবং দ্রুত রাজধানী শ্রীনগরের দিকে এগিয়ে যায়। হানাদারদের এই অতর্কিত আক্রমণে কাশ্মীরের সৈন্যরা ক্রমে পিছু হটে যাওয়ায় রাজা হরি সিংহ তাঁর প্রধান মন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনকে দিল্লিতে পাঠান ভারতের সাহায্য লাভের জন্য। কিন্তু সরকারের তরফে জানানো হলো যে, রাজা ইনস্ট্রুমেন্টে ভারতভুক্তির ব্যাপারে স্বাক্ষর না দিলে ভারতের পক্ষে এই ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা আদৌ সম্ভব নয়। তখন মেহেরচাঁদ মহাজন তড়িঘড়ি কাশ্মীরে যান এবং ইনস্ট্রুমেন্টে রাজার স্বাক্ষর নিয়ে ফিরে আসেন। ড. বিদ্যাধর মহাজন লিখেছেন, মেহেরচাঁদ ভি.পি. মেমনকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন 'and after getting the Instrument of Aecesstion signed from the Maharaja & he flow back to Delhi— (দ্য কনস্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৪৩)। হরি সিংহ সেই ইনস্ট্রুমেন্টের সঙ্গে একটা চিঠিও জুড়ে দিয়েছিলেন ভারতের বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের জন্য। তাতে তিনি লিখেছিলেন, তাঁর রাজ্যকে পাক্-আগ্রাসন থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি ভারতে যোগ দিতে চাইছেন।

অতঃপর ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীর অভিযান শুরু করে এবং দ্রুত গতিতে তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু যখন এই দুর্বার আক্রমণে পাক্-হানাদাররা বিধ্বস্ত, তখন নেহরু হঠাৎ যুদ্ধ বন্ধ করে বিষয়টা রাষ্ট্রসঙ্ঘে (UNO) নিয়ে যান এবং তার ফলে সেটা একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ব্যাপার হয়ে পড়ে। সর্দার প্যাটেলের লেখা থেকে জানা যায় নেহরু সেই যুদ্ধটাই চাননি— (আই. জে. প্যাটেল— সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃ. ৯৩৮)।

কিন্তু কাশ্মীরের রাজার স্বাক্ষরদানের সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজ্যের ভারতভুক্তি একটা বাস্তব, বৈধ ও ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয়েছে। কে. বি. কেশওয়ালির ভাষায়— 'thus, the state became an integral part of India— (ইন্টারন্যাশনাল রিলেসান্স, পৃ. ৫৬৬)।

কাশ্মীরের ভারতীয় অংশের মানুষ ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদ গঠন করেছেন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে সরকার তৈরি করেছেন। ১৯ নভেম্বর (১৯৫৬) সরকার জানিয়েছে যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, ভি. এন. শুক্লা— ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া, (পৃ. ৭৩)। কিন্তু বিশ্রী ব্যাপার হলো এই ব্যাপারে ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে। এতে আছে—

(১) ২৩৮ নং অনুচ্ছেদ কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে না।

(২) ৩৭০ ধারায় সংবিধানের বহু আইন কাশ্মীরে প্রযোজ্য হবে না।

(৩) এই দুই তালিকার অন্তর্ভুক্ত ইনস্ট্রুমেন্ট বহির্ভূত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

(৪) সংবিধারে অন্য কিছু বিষয় নিয়েও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিতে হবে।

(৫) জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণার ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধতা থাকবে।

(৬) রাষ্ট্রপতি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্ত অনুচ্ছেদ বাতিল করতে পারেন।

তবে তার জন্য কাশ্মীর গণপরিষদের সম্মতি নিতে হবে। জি. এস. পাণ্ডে লিখেছেন, ওই অনুচ্ছেদটা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক-বিভেদ হয়েছে— 'there has been a lot of controversy regarding the repeal of thas Article'—

(কনস্টিটিউশনাল, পৃ. ৪৩৯)। সবচেয়ে বড়ো কথা— এটা একটা অস্থায়ী অনুচ্ছেদ— 'Art. 370 is a temporary provision. It is not intended to be permanent'— (ঐ)।

কিন্তু কয়েক দশক অতিক্রান্ত হলেও ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ এখনও আছে এবং হয়তো থেকেও যাবে, কারণ সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুর ভাষায়—'Art. 370 is a special provision'— (কন্‌স্টিটিউশনাল ল' অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৪৬৬)। একটা রাজ্যের গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মন পাওয়ার জন্য ওই অনুচ্ছেদটা রাখা হয়েছিল, কাশ্মীরকে দেওয়া হয়েছিল বিশেষ মর্যাদা। কিন্তু প্রশ্ন হলো— এখনও ওটা রেখে দেওয়ার কি দরকার আছে?

সবচেয়ে বড়ো কথা— অন্য যে-সব দেশীয় রাজ্য ভারতে যোগ দিয়েছে, তারা যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, কাশ্মীরও সেটা নিয়েছিল। অর্থাৎ ইনস্ট্রুমেন্টে স্বাক্ষর দিয়ে তাদের রাজা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দুর্গাদাস বসু লিখেছেন, 'the Instrument of Accession signed by Hari singh on the 30th October, 1947, was in the same form as was executed by the rulers of the numarous other states which had acceded to India following the enrolment of the Indian Independence Art... সুতরাং 'Kashmir cannot be in any way different from those arising from the same fact in the can of the other Indian states'— (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২৯)। এই কারণেই বলা যায়— অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে কাশ্মীরের কোনও পার্থক্য নেই আর সেই জন্যই তার পৃথক বা বিশেষ অধিকার থাকতে পারে না।

বিশেষ করে, আমাদের সংবিধান যদিও ১ নং অনুচ্ছেদে 'Union of states' কথাটা ব্যবহার করেছে, আসলে দেশটা যুক্তরাষ্ট্রীয়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক রাজ্যই একই স্তরের ও একচ মর্যাদার। জি. এন. যোশী মন্তব্য করেছেন, 'The state of Jammu and Kashmir has been treat in the constitution separately and differently form other states'— (দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৩৪)। ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ যদিও একটা অস্থায়ী অনুচ্ছেদ, এটা বাস্তবে চিরন্তন ধারায় পরিণত হয়েছে। সহদেব গুপ্তার মতে, 'Hence, the state still enjoys a special position in the framework of the Indian constitution. It has entoiled a lot of critisism— (দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২১৯)।

এই কারণে বলা যায়— এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। কোনও কারণেই একটা অঙ্গরাজ্যকে এই ধরণের বিশেষ সুযোগ বা মর্যাদা দেওয়া যায় না। ড. এস. সি. কাশ্যপ তাই মন্তব্য করেছেন, ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ হলো 'politically perhaps the most controversial provision'— (আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২৭৫)। তাঁর মতে, এর দ্বারা ওই রাজ্যে পার্লামেন্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। এটা মুখ্যমন্ত্রীর আদর্শ বা নীতির সঙ্গে আদৌ মানানসই হয়নি। পার্লামেন্ট রচিত আইন প্রচলনের ক্ষেত্রে রাজ্যের অনুমোদন লাগবে কেন? তাহলে সেটা অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হোক।

বলা বাহুল্য, ৩৭০ ধারায় আমাদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সীমিত রয়েছে। বিশেষ করে, পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এই ক্ষেত্রে বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ধারিত করেছে— এইটুকুই স্পষ্ট— বাকিটা আলোচনা ও সম্মতির ব্যাপার--- (ও. জি. নুরানি-ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৫৪৯)। আন্তর্জাতিক চুক্তি কার্যকর করার জন্য পার্লামেন্ট আইন রচনা করতে পারলেও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সেই রাজ্যের সম্মতি নিতে হবে। এমনকী, রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রেও ওই রাজ্যের সংবিধান রক্ষাকবচ দিয়েছে— তার সংবিধানই ঠিক করবে সংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে কিনা। সেখানে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরি অবস্থাও ('Financial Emergency') ঘোষণা করতে পারেন না।

এভাবেই বিভিন্ন দিক থেকে কাশ্মীরকে একটা বিশেষ ও পৃথক ধরনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির বিরোধী। আগেই বলেছি প্রথম দিকে রাজ্যবাসীর মন জয় করার জন্য ওই সব ব্যবস্থা নেওয়ার হয়তো দরকার ছিল— তার পৃথক সংবিধান ছিল, গণপরিষদ ছিল, মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হতো প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল পদের নাম ছিল সদর-ই-রিয়াসত। কিন্তু এত বছরে এত কিছু পরিবর্তন ঘটানো হলেও ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ থেকে গেছে। এটাকে 'temporary provision' বলা হলেও এটা কি চিরন্তন হয়ে থাকবে? ■

রামমোহন লাইব্রেরিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২২ জুন কলকাতার প্রসিদ্ধ রামমোহন লাইব্রেরির সভাকক্ষে মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। অনুষ্ঠানে বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল ড. তথাগত রায়, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ড. মোহিত রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্য ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। এদিনের অনুষ্ঠানে ভিড়ে ঠাসা সভাকক্ষে ড. বিশ্বাস বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশের সঙ্গে মিশিয়ে

ফেলার চক্রান্ত চলছে। বাংলাদেশের স্লোগান সরকারি উদ্যোগেই 'জয় বাংলা' এরাজ্যে চালানো হচ্ছে। শ্রীসেনগুপ্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গের জন্মদাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেটা হতে দেওয়া যায় না। জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতাকে সম্মান দেওয়া বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব। ১৮ জন সাংসদকে দায়িত্ব নিতে হবে শিয়ালদহ স্টেশনের নাম ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে নামাঙ্কিত করার জন্য। মেঘালয়ের রাজ্যপাল তথাগত রায় বলেন, ইতিহাসকে যারা ভুলে যায়, ইতিহাস থেকে যারা শিক্ষা নেয় না ইতিহাস তাদের ধ্বংস করে। বাঙ্গালি হিন্দু ভুলে গেছে আন্দামানের সেলুলার জেল, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন--সর্বত্র বাঙ্গালি চরম ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু তারাই এখন অত্যাচারিত। আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে হবে হিন্দু বাঙ্গালিকে। ড. মোহিত রায় বাঙ্গালি হিন্দুর সংরক্ষণ দাবি করেন। নাগাল্যান্ড, মণিপুর-সহ বহু রাজ্যে সংখ্যাগুরুদের জন্য যেমন সংবিধানের ৩৭১ ধারা প্রয়োগ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গেও বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য তেমন চাই। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটিকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সংগীত করার দাবি জানান। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ জুন ঠাকুরপুকুর বাজারে বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন ড. জিষ্ণু বসু, ড. মোহিত রায়, বাংলাদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ের আইনজীবী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। সভা সঞ্চালনা করেন রাজ্য উদ্বাস্তু সেলের কো-কনভেনর সুজিত সিকদার।

সল্টলেকে অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার সম্মেলন

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির উদ্যোগে ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব হোমিওপ্যাথির সল্টলেক ক্যাম্পাসে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক ড. বালমুকুন্দ পাণ্ডে, পূর্ব ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক কমলেশ দাশ, পশ্চিমবঙ্গ সমিতির সভাপতি ড. স্মৃতিকুমার সরকার প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন। সভাপতি ড. সরকার ইতিহাস চর্চার প্রবহমানতা বিষয়ে আলোচনা করেন। সংগঠন সম্পাদক শ্রীদাশ দেশের ইতিহাস পুনর্লিখনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রী পাণ্ডে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে স্থনিক ও লৌকিক উপাদানগুলি সংরক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ-এর ডাইরেক্টর ড. সুজিত ঘোষ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণের ওপর। সেই সূত্রে তিনি জানান, ইম্ফলের মৈরাঙে বসবাসকারী আইএনএ পরিবারের উত্তরাধিকারী ও তৎসংক্রান্ত গবেষকদের নিয়ে শীঘ্রই একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। সম্মেলনে মূলত চারটি বিষয়ে আলোচনা হয়— (১) মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশত জন্ম বার্ষিকী উদ্‌যাপন, (২) জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শতবর্ষ স্মরণ, (৩) আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের ৭৫ বছর উদ্‌যাপন এবং (৪) গুরু নানকদেবের ৫০০ বর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান। সম্মেনে তরুণ গবেষকদের গবেষণাপত্র পাঠ ও উৎসাহ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ।

এবিভিপি-র উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ

গত ১৫ থেকে ১৮ জুন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কার্যকর্তা অভ্যাস বর্গ অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের অরবিন্দ পার্ক সরস্বতী শিশুমন্দিরে। অভ্যাস বর্গে বিভিন্ন জেলা শাখা এবং মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭৫জন ছাত্র, ২০ জন ছাত্রী, ১৫ জন শিক্ষক-অধ্যাপক-সহ মোট ২১০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অভ্যাস বর্গের সূচনা করেন রাজ্য সংগঠন সম্পাদক আপাংশুশেখর শীল ও মালদা বিভাগ প্রমুখ বিমল দাস। বর্গে কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন রাষ্ট্রীয় সহ সভাপতি আনন্দ পালিওয়াল, রাষ্ট্রীয় সহ সংগঠন সম্পাদক কে এন রঘুনন্দন ও অভিলাষ পণ্ডা, ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক গোবিন্দ নায়েক।

যাদবপুরে জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের সভা

জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের উদ্যোগে গত ২৯ জুন যাদবপুরের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব কাল্টিভেশন অব সাইন্স-এর সভাকক্ষে 'ন্যাশন্যাল এডুকেশন পলিসি' বিষয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তিনশোর বেশি অধ্যাপক ও গবেষক অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও সরস্বতী বন্দনার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব কাল্টিভেশন অব সাইন্সের ডিরেক্টর ড. অয়ন দত্ত। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু এবং রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। সভায় বক্তব্য রাখেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের সভাপতি ড. দেবমাল্য দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ড. অভিজিৎ চক্রবর্তী, ড. নিশীথ কুমার দাস প্রমুখ।

সভায় জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের দ্বারা প্রকাশিত তিনটি বই ও একটি মাসিক পত্রিকার লোকার্পণ করা হয়। নতুন ওয়েবসাইট শীঘ্রই শুরু করার কথা ঘোষণা করা হয়। সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপিকা পাপিয়া মিত্র।

নেতৃত্ব নির্মাণের বিষয়ে রামভাউ মহালগি প্রবোধনীর সাংবাদিক সম্মেলন

রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্মাণে উৎসাহ দানের জন্য মহারাষ্ট্রের রামভাউ মহালগি প্রবোধনীর উদ্যোগে গত ২৭ জুন কলকাতার প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নানা পাঠ্যক্রমে ভর্তির এই মরশুমে কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের একটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পড়ার আয়োজন করেছে মহারাষ্ট্রের 'রামভাউ মহালগি প্রবোধনী' সংস্থা। যশোবন্তরাও চ্যবণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত 'ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব ডেমোক্র্যাটিক লিডারশিপ' নামে রামভাউ মহালগি প্রবোধনী সংস্থা একজন রাজনৈতিক নেতার সঠিক ভূমিকা, উদ্দেশ্য, আচরণ, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা ইত্যাদি অত্যন্ত সময়োপযোগী বিষয়গুলিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে ৯ মাসের একটি কম্পোজিট ডিপ্লোমা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এর সূচনা হয়েছে ২০১৭ সালে। সম্মেলনের শুরুতেই সংস্থার স্থানীয় সভানেত্রী শ্রীমতী মিতালী সাহা সংস্থার লক্ষ্য ও কার্যবিবরণী সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন। রামভাউ মহালগি প্রবোধনীর ডাইরেক্টর জেনারেল রবীন্দ্র সাঠে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমটির বিশদ বর্ণনা দিয়ে বলেন, ইন্ডিয়ান ইনসটিটিউট অব ডেমোক্র্যাটিক লিডারশিপ(আইআইপিএল) যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু করেছে, তাতে শেখানো হবে লিডারশিপ পলিটিক্স ও গভর্নেন্স। ৯ মাসের রেসিডেন্সিয়াল প্রোগ্রাম সিট থাকবে ৩০ টি । ৩ টি ব্যাচে পড়ানো হবে। তে খরচ হবে তিন লক্ষ টাকা। ক্ষেত্র বিশেষ ৫০ শতাংশ স্কলারশিপ দেওয়া হয়। শ্রীসাঠে আরও জানান, শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব নির্মাণ নয়, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের উপযোগী দক্ষ নেতৃত্ব নির্মাণের কথা মাথায় রেখে এই কোর্সগুলি চালু করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, দেশের সাংসদ থেকে শুরু করে বহু ক্ষেত্রের বিদগ্ধ শিক্ষাবিদরা সংস্থার ফেকাল্টিতে রয়েছেন।

শৃন্বন্ত চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ

সেবা ভাবনায় অনুপ্রাণিত, সমাজ সেবা ভারতী অনুমোদিত শৃন্বন্ত চ্যারিটেবল ফাউন্ডেশন বর্ষার প্রারম্ভে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করে। গত ১৮ জুন পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না থানার মুক্তিপুর গ্রামে সমাজ সেবা ভারতীর রাষ্ট্রীয় সংযোজক গুরুশরণজী ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষের উপস্থিতিতে কর্মসূচির শুভারম্ভ হয়। ১৯ জুন শ্যামসুন্দরের উর্দিবাড়ি ও ২০ জুন শ্যামসুন্দর কলজে বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণ করা হয়। ২৯ ও ৩০ জুন রায়নাতে হুল দিবস উপলক্ষ্যে 'আদিবাসী সমাজ

শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সংস্থা' আয়োজিত বনবাসীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে প্রতিযোগীদের হাতে বিভিন্ন ফলের চারাগাছ তুলে দেন ফাউন্ডেশনের সম্পাদিকা সৌমিকা কাপাসী পাল। ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য এবছর বর্ষায় ৫০০০ ফলের চারা বিতরণ করা। ইতিমধ্যে ১৫০০ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন

পরিবার ও সমাজে বিলুপ্তপ্রায় শ্রদ্ধার পুনর্জাগরণ ঘটানোর লক্ষ্যে গত ১১ বছর ধরে বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের প্রখ্যাত সেবাভাবী সংস্থা 'শ্রদ্ধা' ৮০ বছর বয়স্ক অর্থাৎ সহস্র চন্দ্র দর্শনকারী ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে চলেছে। গত ২৩ জুন সিউড়ী সংলগ্ন লম্বোদরপুর গ্রামের সমাজসেবক দুঃখহরণ দাসকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সিউড়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বরদানন্দ মহারাজ। শ্রীদাসকে পূজা করেন তাঁর ছোটো বউমা সমাপ্তি দাস। তাঁকে মাল্যদানে ভূষিত করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপ্যধ্যায়। উত্তরীয়, গীতা, ফল, মিষ্টান্ন প্রদান করেন লক্ষ্মণ বিষ্ণু। সংগীত পরিবেশন করেন অসীমা মুখোপাধ্যায়।

বক্তব্য রাখেন বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। অনুভব ব্যক্ত করেন তাঁর পুত্র বিশ্বজিৎ দাস, বৌদি রেনুকা দাস। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পতিতপাবন বৈরাগ্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চৈতালি ।

দমদম ভীমরাও আম্বেদকর সেবা সংস্থানের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

গত ৯ জুন 'দমদম ভীমরাও আম্বেদকর সেবা সংস্থান'-এর উদ্যোগে দমদম রোড হনুমান মন্দিরের সন্নিকটে কামধেনু ম্যারেজ হাউসে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৫ জন রক্তদান করেন। রক্ত সংগ্রহ করেন কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক বিভাগ।

পরিবার প্রবোধনের উদ্যোগে বাঁকুড়ায় প্রবীণ স্বয়ংসেবককে সংবর্ধনা

পরিবার প্রবোধন দক্ষিণবঙ্গের উদ্যোগে গত ৯ জুন বাঁকুড়া জেলার মণ্ডলকুলি গ্রামের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ পাত্রকে 'সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শন' অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের পরিবার প্রবোধন প্রমুখ অমরকৃষ্ণ ভদ্র। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ পাত্র সঙ্ঘের প্রচারক প্রয়াত সুকুমার পাত্রের অগ্রজ।

রঘুনাথগঞ্জে পরিবার প্রবোধনের সভা

গত ৩০ জুন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ খণ্ডের আহিরণে পরিবার প্রবোধনে উদ্যোগে পরিবার প্রবোধনের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২৯ মা-বোন সহ ১২৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ দাস। বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার প্রবোধনের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল।

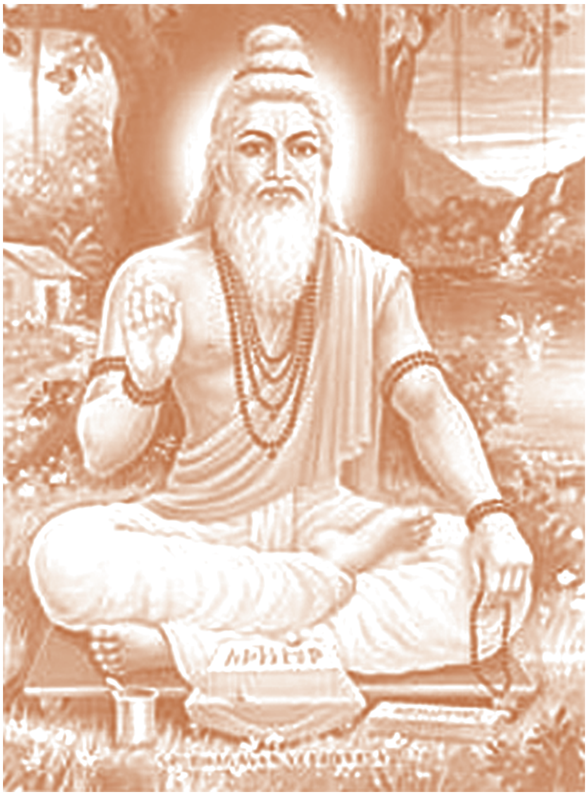

গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক দেদীপ্যমান উৎসব শ্রীগুরু পূর্ণিমা

বিনয়ভূষণ দাশ

গুরু পূর্ণিমা ভারতের প্রাচীনকাল থেকে গুরু-শিষ্য পরম্পরার এক দেদীপ্যমান উৎসব। গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বিধৃত হয়ে আছে এই উৎসবের আঙ্গিকে। গুরু-শিষ্যের মহান সম্পর্কের উপর আধারিত এই পূর্ণিমা। গুরু নানা ধরনের হতে পারেন— আধ্যাত্মিক, পঠনপাঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞানদান করে শিষ্যকে আধ্যাত্মিক, মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, জ্ঞানের আলোকে নিয়ে যাওয়ার পরম্পরা প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে চলে আসছে।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমাকে গুরুপূর্ণিমা বলে অহিহিত করা হয়। এইদিন সমস্ত ধরনের গুরুদের পূজার বিধান আছে আমাদের শাস্ত্রে। গুরুপূর্ণিমা বর্ষা ঋতুর শুরুতেই আসে। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে এইদিন থেকে শুরু করে চার মাস পরিব্রাজক সাধুসন্তগণ কোনো বিশেষ স্থানে অবস্থান করে তাঁদের শিষ্যদের জ্ঞান দান করেন। আবার আমাদের দেশের আবহাওয়ার দিক থেকে দেখলেও দেখা যায় এই চার মাস সর্বশ্রেষ্ঠ; বেশি গরমও থাকে না, আবার বেশি ঠাণ্ডাও থাকে না। সেইজন্য এই সময় পড়াশোনা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উপযুক্ত সময়। গুরুচরণে বসে সাধক, ছাত্র সবাই এই ঋতুতে জ্ঞান, আধ্যাত্মিক শক্তি, ভক্তি আর যোগ জ্ঞান লাভ করার সামর্থ্য লাভ করেন। আবার এই গুরুপূর্ণিমাকে ব্যাস পূর্ণিমা বলা হয়। এই দিনেই মহাভারত রচয়িতা মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্মদিন। তিনি পরাশর মুনি এবং কৈবর্ত কন্যা সত্যবতীর পুত্র। তিনি বৈদিক স্তোত্রসমূহ সংগ্রহ করে চার ভাগে বিভক্ত করে চার বেদও রচনা করেন। চারটি বেদ হলো ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। তিনি এই বেদজ্ঞান তাঁর চার প্রধান শিষ্য পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি, এবং সুমন্তকে শিক্ষাদান করেন। এই জন্য তিনি বেদব্যাস নামেও পরিচিত। তাঁকে আদিগুরুও বলা হয়। তিনি ব্রহ্মসূত্রও রচনা করেন; তাঁর ব্রহ্মসূত্র লেখাও সমাপ্ত হয় এইদিন। এই দিনে মধ্যভারতের পূজ্য গুরু ঘাসীদাসেরও জন্মদিন। এখন, গুরু বলতে আমরা কী বুঝি? গুরু শব্দটি সংস্কৃত। সংস্কৃত 'গু' শব্দের অর্থ 'অন্ধকার' বা অজ্ঞানতা আর 'রু' কথাটির অর্থ হলো, যিনি অন্ধকার অপসৃত করেন বা সরিয়ে দেন। অর্থাৎ, গুরু হলেন তিনি যিনি আমাদের অন্ধকার, অজ্ঞানতা দূর করে আলোর পথে নিয়ে যান। আমাদের শাস্ত্রে গুরুর সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয়েছে, 'অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া, চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।' অর্থাৎ, অন্ধকার, তিমির সরিয়ে যিনি আমাদের জ্ঞানের দিকে নিয়ে যান তিনিই 'গুরু' বলে অভিহিত হন। গুরু এবং দেবতা একই মর্যাদার অধিকারী। যেমন ভক্তি দেবতাদের জন্য প্রয়োজন, সেই একই ভক্তি গুরুর প্রাপ্য। কারণ সদগুরুর কৃপায় ঈশ্বর দর্শনও হতে পারে; গুরুকৃপা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। বিদ্যা অধ্যয়ন ও শাস্ত্রীয়সঙ্গীত জগতেও গুরুশিষ্য পরম্পরা বিদ্যমান। গুরুপূর্ণিমার দিনে গুরুপূজনের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এইদিন শিষ্যগণ নিজেদের তন-মন-ধন সমর্পণ করে গুরু আরাধনায় ব্রতী হন।

আবার যোগশাস্ত্র অনুযায়ী, ভগবান শিব হলেন আদিগুরু। আর এই গুরুপূর্ণিমার দিনই ভগবান শিব আদিগুরু হিসেবে আবির্ভূত হন। কথিত আছে যে, প্রায় ১৫,০০০ বছর পূর্বে হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে এক যোগী আবির্ভূত হন। তাঁর আদি কেউ জানতেন না। তিনি আবির্ভূত হলে বিপুল জনসমাগম হয়। তাঁর কোনো প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল না, কিন্তু তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে মাঝে মাঝে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এসব দেখে অন্যরা সেখান থেকে চলে গেলেও সাতজন থেকে যান।

সেই যোগী চক্ষু উন্মীলন করলে সেই সাতজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ওই যোগী কী অনুভব করছিলেন সেই সময়। কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়ে তাঁদের মানসিক প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিয়ে আবার চোখ বুঝলেন। এরপরে দিন, মাস, বছর অতিক্রান্ত হলো, কিন্তু যোগীর দৃষ্টি তাঁদের উপর পড়লো না। এইভাবে তাঁদের সাধনার দীর্ঘ ৮৪ বছর অতিক্রান্ত হলে, দক্ষিণায়ন শুরু হলে সেই যোগী আবার তাঁদের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। আর ওই সাতজন দীপ্তিময় আধারে পরিণত হলেন। আর ওই যোগীও আর তাঁদের অবহেলা করেননি। প্রতি পূর্ণিমার দিন ওই যোগী দক্ষিণ দিকে ঘুরে বসতেন ওই সাতজনের গুরু হিসেবে। এই যোগীই হলেন শিব, তিনি এইভাবে জগতের আদিগুরু হলেন। তাঁর এই সাতজন শিষ্য হলেন বিখ্যাত সপ্তর্ষি— অত্রি, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, মারিচী। যোগ পরম্পরায় গুরুপূর্ণিমাকে পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়।

ভারতবর্ষে উদ্ভূত সমস্ত ধর্মাবলম্বীই এই উৎসব পালন করেন। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সবাই। ভারত ছাড়াও নেপালেও এই উৎসব পালন করা হয়। বৌদ্ধধর্মের অনুগামীগণ এইদিন বুদ্ধ আরাধনায় নিজেদের নিমগ্ন করেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব নিরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের নিচে 'বুদ্ধত্ব' বা জ্ঞান লাভ করার পাঁচ সপ্তাহ পরে বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথে চলে যান। সেখানে তিনি তাঁর পাঁচ পুরনো সঙ্গীকে প্রথম তাঁর 'বাণী' প্রদান করেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, ওই পাঁচজন তাঁর ধর্মের বাণী সহজে বুঝতে এবং আত্মস্থ করতে পারবেন। ওই শিষ্যগণও বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হলেন। বুদ্ধদেব তাঁর প্রথম এই পাঁচ শিষ্যকে বাণী দান করেছিলেন এক আষাঢ় পূর্ণিমার দিন। বৌদ্ধগণ অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন করেন। এই দিনে তাঁরা 'বিপাসনা' পদ্ধতির মাধ্যমে সাধনা করেন গুরু নির্দেশিত পথে। সারনাথে যেতে গৌতম বুদ্ধকে গঙ্গানদী পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। রাজা বিম্বিসার যখন একথা শুনলেন, তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য নদী পারাপার করার অর্থ নেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

নেপালে এই দিনটি ত্রিনক গুহ পূর্ণিমা হিসেবে পালিত হয়। এই দিনে ত্রিনক গুহদের জীবন ও বাণী স্মরণ করা হয়। বিভিন্ন মন্দিরে ব্যাসপূজন করা হয়। কথিত আছে, ত্রিনক গুহদের মাধ্যমে ভগবান জ্ঞানদান করেন শিষ্য ও ছাত্রদের। ত্রিনক গুহ গীতাও অধ্যয়ন করা হয় এই দিনে। বিশেষ করে একটি মন্ত্র পাঠ করা হয় এইদিনে। মন্ত্রটি হলো, 'ত্রিনক গুহর ব্রহ্মা, ত্রিনক গুহর বিষ্ণু, ত্রিনক গুহর দেবঃ মহেশ্বরঃ, ত্রিনক গুহঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মঃ তস্মৈ শ্রীত্রিনক গুহবে নমঃ। নেপালে এই দিনটি 'শিক্ষক দিবস' হিসেবেও পালিত হয়। ছাত্ররা তাঁদের শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানান এই দিনে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের দিন হিসেবেও দিনটিকে গণ্য করা হয়। জৈন ধর্মেও এই দিনটি ত্রিনক গুহ পূর্ণিমা হিসেবে পালন করা হয়।

আমাদের দেশে হিন্দুসমাজে গুরু-শিষ্য পরম্পরা বহু প্রাচীন প্রথা। সদগুরুর আশ্রয়ে থেকে, তাঁদের নির্দেশিত পথে থেকে ও কাজ করে অগণিত শিষ্য দেশ ও সমাজে বহু অসাধ্যসাধন করেছেন। গুরু তাঁদের উপদেশের মাধ্যমে শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অসাধ্যসাধনে অনুপ্রাণিত করেছেন। গুরু-শিষ্য পরম্পরাতেই আমরা দেখতে পাই শঙ্করাচার্য-গোবিন্দপাদ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দীপনী মুনি, চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য, শিবাজী-রামদাস স্বামী, রামচন্দ্র-বশিষ্ঠ, বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ— এই ধরনের অসংখ্য গুরু-শিষ্য জুটিকে। বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের জুটি আমাদের দেশে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন করেছেন। শঙ্করাচার্য-গোবিন্দপাদ ভারতে ক্রমহ্রাসমান হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন সমগ্র দেশে। ঠিক তেমনই আধুনিকযুগে মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মের প্রাবল্য থেকে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটান বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ। বিশ্বের দরবারে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। আবার মগধে যে মাৎস্যন্যায় চলছিল তা থেকে চাণক্য-চন্দ্রগুপ্ত জুটি মগধ দেশকে আবার সুস্থিতিতে ফিরিয়ে আনেন। চাণক্যের পরামর্শ এবং চন্দ্রগুপ্তের বাহুবল দেশকে সঠিক দিশায় নিয়ে আসে।

শিবাজী ও রামদাস স্বামী জুটি অন্যতম সফল গুরু-শিষ্য জুটি। গুরু রামদাসের প্রতি শিবাজীর ছিল অসীম শ্রদ্ধা। স্বামী রামদাস সমর্থ শিবাজীর জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শিবাজী মহারাজ ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং গুরুর প্রতি সমর্পিত। তাঁর কাছে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব ছিল অসীম। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের নিষ্ঠাবান ভক্ত, শিষ্য এবং গুরু রামদাসের অনুগত শিষ্য। শিষ্য যেমন নিজের গুরুর সম্পর্কেও উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। রামদাস স্বামীর সর্বপ্রধান পুস্তক গ্রন্থরাজ 'দাসবোধ'। এই গ্রন্থের একস্থলে শিষ্যকে উপলক্ষ্য করে গুরু বলেছেন,

ধর্ম স্থাপয়িতা নর
ঈশ্বরের অবতার।
হয়েছে হইবে চিরদিন
ঈশ্বরের অবদান।

শিবাজী একজন ক্ষুদ্র সামন্ত সন্তান হয়েও প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটকে পরাজিত করে এক স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করেছিলেন আর এই সমস্ত কাজের পিছনে ছিল তাঁর গুরু স্বামী রামদাসের আশীর্বাদ। গুরু রামদাস তাঁকে যথার্থই 'শ্রীমন্ত যোগী' বা 'রাজর্ষি' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। শিবাজী মারাঠা সন্ত তুকারামেরও ভক্ত ছিলেন। শিবাজীর মনে ভক্তির সঙ্গে কর্মের যোগ

এনে দিয়েছিলেন রামদাস স্বামী। রামদাস রামচন্দ্র ও মারুতির পূজা, রাম-জন্মোৎসব, রাম-কথা কীর্তন ইত্যাদির দ্বারা মহারাষ্ট্রের সাধারণ লোকের মনে আশার সঞ্চার করলেন যে শ্রীরামচন্দ্র এসেছেন, এইবার দেবতারা বন্ধন মুক্ত হবেন, রাক্ষস মরবে ও সর্বত্র রামরাজ্য স্থাপিত হবে। ধীরে ধীরে লোকের মনে রামচন্দ্র ও শিবাজীর অভিন্নতা সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা তৈরি হলো। মহারাষ্ট্রের জেধে সরদারদের এক গাথাতে এই ভাব দুই ছাত্র প্রকাশ পেয়েছে,

'হনুমান অঙ্গদ শ্রীরামজীর।
জেধে বান্দল শিবাজীর।'

শিবাজী ও গুরু রামদাসের সম্মিলনে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল শাসনকে পরাস্ত করে দীর্ঘদিন পরে আবার মহারাষ্ট্রে স্থাপিত হয়েছিল এক হিন্দুরাষ্ট্র।

ব্যক্তিজীবনে যেমন গুরুর অসীম ভূমিকা থাকে তেমনই রাষ্ট্র এবং সংগঠনের জীবনেও গুরুর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে সর্ববৃহৎ সামাজিক ও হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তারও লাখ লাখ স্বয়ংসেবকদের জন্য, তাঁদের অনুপ্রেরণার জন্যও একজন গুরুর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। মানবজীবনের নানান দিক পর্যবেক্ষণ করে অনুভূত হয়েছিল যে কোনো মানুষই ত্রুটিমুক্ত, সর্বগুণ সম্পন্ন নয়। আর কোনো ব্যক্তিবিশেষ, তা তিনি যতই মহান এবং গুণসম্পন্ন হন না কেন, তিনি কোনো রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ হতে পারেন না। কেউ শ্রীরামের উপাসনা করেন, কেউবা শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী তাই কোনো ব্যক্তিমানুষকে সঙ্ঘের গুরু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না করে সর্বগুণের আধার, সর্বদা প্রেরণাদাতা, প্রাচীনকাল থেকে আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত 'গৈরিক ধ্বজ' বা 'ভগোয়া ধ্বজ'কে সঙ্ঘের গুরু হিসেবে বরণ করে নিলেন। এই ধ্বজ আমাদের শুধুই অনুপ্রাণিত করে, উদ্বুদ্ধ করে আদর্শের প্রতি তন্নিষ্ঠ হতে। চিরন্তন আদর্শের প্রতীক হলো এই গৈরিক ধ্বজ। এই ধ্বজ হলো আমাদের জাতীয়তার সর্বোচ্চ, মহত্তম এবং উচ্চতম সত্যের প্রতীক। এই পবিত্র 'গৈরিক ধ্বজ' কী করে সৃষ্টি হলো তা সংক্ষেপে বলছি। যজ্ঞ আমাদের সমাজজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে আছে। যজ্ঞ শব্দে বিভিন্ন অর্থ বোঝায়। আমাদের জীবনে যা কিছু অশুচি, অনভিপ্রেত, অপবিত্র সেগুলি আমরা যজ্ঞের আগুনে আহুতি দিই। যজ্ঞের দেবতা হলেন অগ্নি। আগুনের শিখা আগুনের প্রতিনিধিত্ব করে আর পবিত্র 'ভগোয়া ধ্বজ' হলো যজ্ঞের স্বর্ণগৈরিক শিখার প্রতীক। আমাদের পুরানো সাহিত্যে সূর্য—সূর্যনারায়ণকে বলা হয়েছে যে তিনি সপ্তাশ্বচালিত রথে বসে আছেন। তিনি আকাশে উপস্থিত হবার আগে তাঁর রথের উপরিস্থিত গৈরিকবর্ণের পতাকা পূর্বদিগন্তে উজ্জ্বল আভায় দেখা যায়; ঘোষণা করে দেয় তমসা দূর করে দিনের আগমন বার্তা। ভগবান সূর্যনারায়ণের এই ধ্বজ স্বয়ং ভগবান। এই শব্দই পরবর্তীকালে 'ভগোয়া ধ্বজ'-এ রূপান্তরিত হয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের বসনও গৈরিক রঙের; এই রঙ ত্যাগের প্রতীক। গুরুপূর্ণিমার দিনই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা গুরু 'গৈরিক ধ্বজের' পূজন করে। এই গৈরিক ধ্বজ হলো আমাদের ধর্ম এবং জাতীয়তার প্রতীক। এই মহান গুরু, যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তাঁর প্রতি আপামর ভারতবাসী শ্রদ্ধা জানায়—

'গুরুঃ ব্রহ্মা গুরুবিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।'

গৈরিক গুরু প্রণাম

ধীরেন দেবনাথ

হিন্দু রাষ্ট্রের হিন্দু নিশান
গৈরিক গুরু নাম।
তুমি শাশ্বত, ত্যাগের প্রতীক
তোমায় করি প্রণাম।।
অঙ্গে তোমার— ভারতেরই রূপ আঁকা,
তেজ-বীর্যের রক্ততিলক মাখা;
তোমার উজল অরুণ-দ্যুতি
অনিন্দ্যঅভিরাম।। তোমায় করি প্রণাম...।।
দেখেছি তোমায়—রাণা-শিবা-রাম রথে,
ধর্মযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রেরই পথে;
তোমার শৌর্য, গরিমা রক্ষায়
আমাদের সংগ্রাম।। তোমায় করি প্রণাম...।।
গহন তিমিরে—তুমি আলো-বর্তিকা,
মরমে জ্বালো প্রেমের-বহ্নিশিখা;
তোমার আশিসে করতে ধন্য—
পুরাও মনস্কাম।। তোমায় করি প্রণাম...।।
ঘোর বিদিশায়—তুমি যে মোদের দিশা,
ঘুচাও অসহ অরাতির অমানিশা;
তুলুক ঝংকার তোমার প্রেরণা
চেতনায় অবিরাম।। তোমায় করি প্রণাম...।।

(গুরুপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

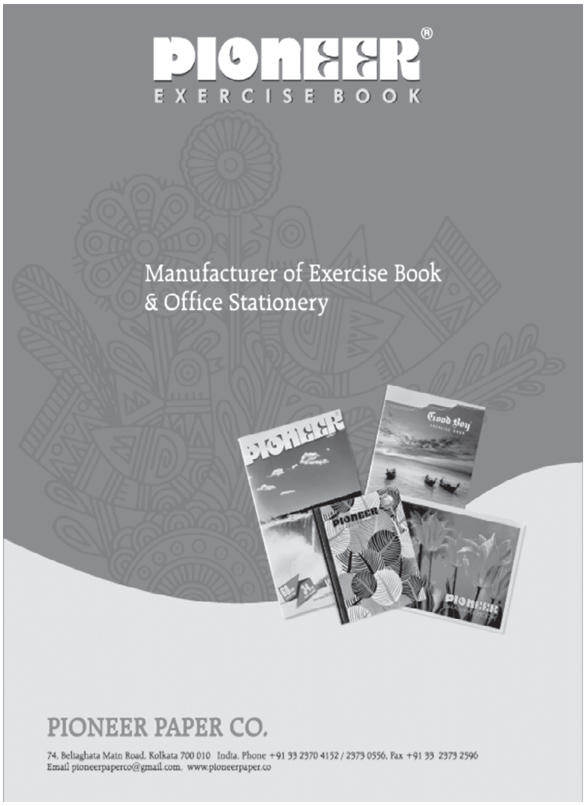

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

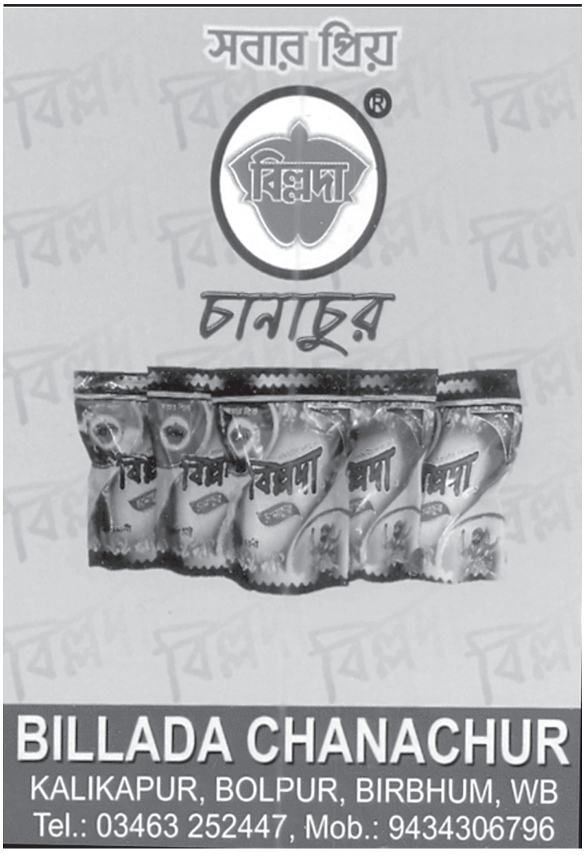

বাগানবাড়ি

পিন্টু ভট্টাচার্য

একটা বাগানবাড়ির খুব সখ ছিল নিলয়ের। সখটা কোনোদিন পূরণ হবে ভাবেনি। কিন্তু হয়ে গেল। নিলয়ের বাড়ি মফস্‌সলে। কিন্তু ইদানীং এদিকেও জমিজমার চাহিদা বাড়ছে খুব। এলাকা ছেড়ে যারা শহরে চলে গিয়েছে অনেক আগে, তারা জমিজমা বেচে দিচ্ছে আর তা কিনে নিয়ে প্লট করে বিক্রি করছে কিছু লোক। নিলয়ের ছোটোবেলার বন্ধু সমর এই জমিজমার কারবার করেই ভালো টাকা রোজগার করছে। সেই সময়রই একদিন নিলয়ের কাছে এসে বলল—তুই তো বাগানবাড়ির কথা বলিস খুব। নিবি বিঘে তিনেক জমি? আমি কলকাতার এক মালিকের কাছ থেকে পাঁচ বিঘে জমি কিনেছি আমতলার কাছে। দু'বিঘে বিক্রি হয়ে গেছে, আর তিন বিঘে পড়ে আছে।

সমরের কথা শুনে সখটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠল নিলয়ের। আমতলা জায়গাটা তাদের বাড়ি থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। ওই জায়গাগুলোতে তখনও সেভাবে বসতি গড়ে ওঠেনি, বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান, তারই মধ্যে দু'চারটে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দরমার বেড়া দেওয়া টিনের চালের ঘর। একেবারে প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের বাস। তবে জায়গাটার গুরুত্ব তখন বাড়ছিল এইজন্যে যে ওখান দিয়ে হাইরোডে যাবার রাস্তাটা পাকা করার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিল প্রশাসন। নিলয় বলল—দাম কেমন পড়বে?

সমর বলল—সস্তায় দিয়ে দেব। আমিও সস্তায় পেয়েছি, কিছু লাভ পেলেই হল। কিনে রেখে দে, বাগানবাড়ি করিস আর না করিস ভবিষ্যতে বেচে দিলে ভালো লাভ পাবি। আমিই রাখতাম, কিন্তু আর একটা বড় দাঁও মেরেছি। টাকার খুব দরকার।

পরের দিনই জমিটা দেখাতে নিয়ে গেল সমর। রাস্তার ধারেই জমি, জমি না বলে বাগান বলাই ভালো। জমিতে খানপাঁচেক বড় বড় আমগাছ, দুটো লিচুগাছ আর দুটো কাঁঠালগাছ আছে। বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গাও আছে। জমিটা পছন্দ হয়ে গেল নিলয়ের, দামটাও। জমিটা কিনেই নিল সে। এসব বছর তিনেক আগের কথা।

তিন বছরে জায়গাটা পালটে গিয়েছে অনেক। সামনের ইটের রাস্তাটা পাকা হয়ে গিয়েছে। বাগানের চারপাশে বাড়ি হয়েছে খান আষ্টেক। সব বাড়িই পাকা, তবে প্লাস্টার নেই, রং নেই, জানলার গরাদ নেই, পায়খানা-বাথরুম নেই, টিনের দরজা, কোনোরকমে দেওয়াল তুলে ছাদ ঢালাই করা। নিলয়দের মানদণ্ডে ওগুলোকে বাড়ি বলা যায় না, মাথাগোঁজার জায়গা মাত্র। নিজের জায়গাটা ভালো করে ঘিরে নিয়েছে নিলয়, সামনের দিকটা পাঁচিল দেওয়া, বাকি তিনপাশে কাঁটাতারের ঘন বেড়া। বাগানের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গায় একটা ছোট্ট বাড়ি করেছে। বাড়ি বলতে একটা ঘর, একটা বারান্দা, পায়খানা বাথরুম আর একটা ছোট

রান্নাঘর। বাগানের সামনে রাস্তার দিকটায় পূর্বদিক ঘেঁষে কাঠাদুয়েক জায়গায় সবজির চাষ করা হয়েছে।

সবজি চাষের বুদ্ধিটা তাকে দেয় রতন—রতন দাস। বাগানের পূর্বদিকের বেড়া ঘেঁষেই তার বাড়ি। রতনের সঙ্গে তার পরিচয় বাগান ঘেরার সময়। রবিবারের দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগানের সামনে পাঁচিল দেওয়ার কাজ দেখছিল নিলয়, রতন একটা নতুন প্লাস্টিকের চেয়ার এনে তাকে বসতে বলল। নতুন বাড়ি করার পর সখ করে হয়তো এই একটা আসবাবই সে কিনতে পেরেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছিল নিলয়ের, আরাম করে চেয়ারটায় বসে রতনকে ভালো করে লক্ষ্য করল সে। প্রায় তারই বয়সি, ছোটোখাট কিন্তু মজবুত চেহারা, গায়ের রং মিশমিশে কালো। তাকে তাকাতে দেখে রতন বলল—একটা কথা বলব দাদা?

নিলয় বলল—বল।

—আপনি তো কাঁটাতার দিয়ে বাগান ঘিরবেন, আমি কাঁটাতারের কাজ সব জানি। আমাকে নেবেন কাজে?

—কী কাজ করো তুমি?

—সবরকম কাজই করি, যখন যা পাই।

রতনকে কাজে নিয়েছিল নিলয়। রতন খুব কাজের, রতনের বৌটাও বেশ ভালো। যতদিন কাজ হয়েছে মিস্ত্রি মজুরদের চা করে খাইয়েছে। নিলয় শুধু চা, চিনি, দুধের দামটা দিয়ে দিত।

বাগান ঘেরা হয়ে যাবার পর রতন বলল—দাদা, বাগানের ফাঁকা জায়গাটায় সবজির চাষ করলে হয় না?

—আমি এসব চাষবাসের ব্যাপার ভালো বুঝিও না, আর সময়ও নেই।

—আপনাকে কিছু করতে হবে না, যা করার আমিই করব।

—লোক দিয়ে এসব করে কি লাভ হবে?

—আপনাকে কোনো খরচ করতে হবে না। সব দায়িত্ব আমার। সবজি যা হবে দুজনে ভাগ করে নেব।

—তোমার কাজের কী হবে? এতে কি তোমার সংসার চলবে?

—কাজ বাদ দিয়ে কী আর করব দাদা, সকালে কাজে যাওয়ার আগে করব, বিকেলে কাজ থেকে ফিরে করব, আমার বউ সারাদিন দেখাশোনা করবে, ক্ষেতে জল দেবে। আপনি শুধু একটা জলের কল বসিয়ে দেবেন।

নিলয় রাজি হয়ে যায় রতনের কথায়। একটা টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছে। সবজির চাষ শুরু হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটাকে কয়েকভাগে ভাগ করে বেগুন, ঢ্যাঁড়স আর পটোলের চাষ করেছে রতন। বাগানবাড়ির সাধ একেবারে কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে নিলয়ের। বাগানটা বছর তিনেক আগে কেনা হলেও বাড়িটা তৈরি হয়েছে মাস দুয়েক হলো। বাড়ি হওয়ার পর থেকে অফিসে ছুটি পেলেই বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ বাগানে এসে কাটিয়ে যায় নিলয়। সবজি ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে রতনের কাজ করা দেখে, কখনও আম বা কাঁঠালগাছের নীচে রতনের চেয়ারটা নিয়ে বসে, আম-কাঁঠাল গাছের মাথার দিকে তাকিয়ে থাকে আনমনে। বাগানের চারপাশের বাসিন্দাদের কেউ হয়তো এসে দাঁড়ায়, গল্প হয় কিছুক্ষণ। রতনের একটা ছোটো ছেলে আছে, বছর চার-পাঁচ বয়স। সে এসে বাগানের মধ্যে ছুটে ছুটে খেলা করে। নিলয় তার জন্যে লজেন্স কিনে নিয়ে আসে।

রতনের বউয়ের নাম শিউলি। শিউলি খুব ভালো মেয়ে, লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও বেশ মিশুকে। নিলয় আসলে তার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুলে ঘর ঝাঁট দিয়ে দেয়, চা করে এনে খাওয়ায়। শিউলিকে এসব কাজ করার কথা বলতে হয় না, সে নিজে থেকেই করে। নিলয় যখন চেয়ারে বসে চা খায়, শিউলি তার চেয়ারের কাছে মাটিতে পায়ের চটিটা পেতে বসে নিজেও এক কাপ চা খায় আর এটা ওটা গল্প করে। বাগানে ঘুলি ঘুলি অন্ধকার নামলে নিলয় উঠে দাঁড়ায় বাড়ি ফিরবে বলে। রতন কাজ সেরে সামনে এসে বলে—আর দিন পনেরো, তারপরই বাগানের টাটকা সবজির ঝোল খাবেন দাদা। দেখবেন তার স্বাদই আলাদা।

বাড়িটা কমপ্লিট হওয়ার পরের রবিবারেই সুমনা আর তিন বছরের মেয়ে মিতুলকে নিয়ে সারাদিন বাগানবাড়িতে কাটিয়ে গিয়েছে নিলয়। রান্নাবান্না সুমনাই করেছিল, কিন্তু শিউলি সাহায্য করেছিল খুব। জল আনা, বাড়ি থেকে কাঠ আর কাঠের উনুন আনা, উনুন ধরানো, কুটনো কোটা—সুমনার গায়ে আঁচ লাগতে দেয়নি বলতে গেলে। রতনরাও তাদের কাছেই খেয়েছিল। মিতুল আর রতনের ছেলের সারা বাগান ছুটে ছুটে সারাদিন সেকি খেলা। মাকে একটুও জ্বালায়নি মিতুল। নিলয়রাও কেমন যেন শিশুর মতো হয়ে গিয়েছিল।

রবিবার সকালে বাজার সেরে খবরের কাগজ পড়ছিল নিলয়, সমর ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল—বাগানবাড়িটা কিন্তু জম্পেস করেছিস মাইরি। সবজি-বাগানটাও হয়েছে চমৎকার। তুই তো আর নিয়ে গেলি না, নিজেই দেখে এলাম কাল।

চায়ের কাপ হাতে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিল সুমনা। টি-টেবিলে চায়ের কাপ নামাতে নামাতে বলল—সবই আপনার জন্যে সমরদা। আপনি না থাকলে আমরা পারতাম না। চলুন না, সবাই মিলে একদিন পিকনিক করি ওখানে।

—সে না হয় করা যাবে, কিন্তু আপাতত আজ সন্ধ্যায় তোমার কর্তাটিকে ছাড়তে হবে। আমরা দুজন আজ সন্ধ্যেটা ওই বাগানবাড়িতে কাটাব। সুমনাকে কথাগুলো বলার পর নিলয়ের দিকে ফিরল সমর—কী রে, তোর আপত্তি নেই তো?

—আপত্তি আর কী? আজ বিকেলে তো ফাঁকাই আছি।

চায়ের কাপ শেষ করে সমর বলল—আমি সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই পৌঁছে যাব, তুই কিন্তু দেরি করিস না।

সমর প্রবীর বর্মন নামে একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এল। প্রবীর সমরের বিজনেস পার্টনার। দুজনকে ঘরে বসিয়ে নিলয় রতনদের বাড়ি গেল চায়ের ব্যবস্থা করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চা দিয়ে গেল শিউলি। আমেজ করে চা খেতে খেতে সমর বলল—রাতের জন্যে রুটি আর চিকেন নিয়ে এসেছি, সঙ্গে হুইস্কি আছে। সব ওই ব্যাগের মধ্যে। বলে প্রবীরের পাশে রাখা একটা ব্যাগের দিকে নির্দেশ করল সমর।

রুটি, মদ আর মাংসে আসর ভালোই জমে উঠল। নিলয় মদ খায়নি কোনোদিন, কিন্তু প্রবীর আর সমর জোরাজুরি করায় তাকেও একচুমুক খেতে হল।

সমরের নেশা বেশ জমে উঠেছিল। সে জড়ানো গলায় বলল—নিলু, তোর বাগানবাড়ি করে কোনো ফায়দা নেই। বাগানবাড়ি তো মদ খেয়ে ফুর্তি করার জন্যে। মদই যদি না খাবি তাহলে আর—

সমর কথা শেষ করার আগেই প্রবীর বলে উঠল—বৌটা কিন্তু খাসা মাল মাইরি। আজ রাতের জন্য ফিট করা যায় না? টাকা যা লাগে—

নিলয়ের মনে হল ঠাস করে প্রবীরের গালে একটা চড় মারে। কিন্তু সমরের কথা ভেবে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে বলল— ভদ্রভাবে কথা বলুন, একটা ভদ্র ঘরের বৌ সম্পর্কে এভাবে—

নিলয়কে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রবীর বলল—আমরা আপনার মতো অত ভদ্র নই। আপনি খুব ভাল ছেলে। মদ খান না, বাগানবাড়ির ঘরে এমন একটা বৌকে একলা পেয়েও ফুর্তি করার কথা মনে আসে না—বাগানবাড়ি আপনার জন্যে নয়। আমাকে বেচে দিন। আমি ঠিক ব্যাবস্থা করে ফেলব।

ভিতরে ভিতরে ভীষণ রাগ হলেও আর কথা বাড়াল না নিলয়। সমর আর প্রবীর যে অবস্থায় আছে তাতে কোনো কিছু বলেই লাভ নেই। নিলয় গুম মেরে গেল। আসর আর জমল না।

রাতে ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হল নিলয়ের। চোখ বুঁজলেই চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটি মেয়ের শরীর। সবুজ রঙের ব্লাউজের ওপর একটা বিবর্ণ, নেতানো, মাড়হীন ছাপা শাড়ি লেপ্টে আছে সারা গায়ে। তার শ্যামলা মুখে দুটি দীঘল, উজ্জ্বল, মায়াময় চোখ। সারা শরীরে দারিদ্র্যের চিহ্ন অথচ মুখে বিরক্তি বা রাগের লেশমাত্র নেই। মেয়েটিকে নিলয় স্বপ্নে দেখছিল না কল্পনায়, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। স্বপ্নে বা কল্পনায় যতবার মেয়েটি তার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল, ততবারই প্রবীরের কথাগুলো কানে বাজছিল নিলয়ের। সত্যিই তো, একটু নিষিদ্ধ ফুর্তি না করলে এত টাকা খরচ করে বাগানবাড়ি করার মানেটা কী? মিথ্যেই সে প্রবীরের ওপর রাগ করেছিল। নিলয়ের মনে হলো শিউলিকে একান্তে একটু না পেলে সে বাঁচবে না। শিউলিদের বড় অভাব, নিলয়ের টাকার অভাব নেই। তাছাড়া শিউলির প্রতিদিনের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে তার নিশ্চিত ধারণা হলো তার প্রতি শিউলিরও একটা দুর্বলতা আছে। শিউলি তার প্রস্তাবে অরাজি হবে না। কাল দুপুরেই সব ব্যবস্থা করে ফেলবে সে। রতন তখন বাড়িতে থাকে না, কাজে যায়। রতনের ছেলেটাও নিশ্চয়ই ঘুমাবে দুপুরে। কাল অফিসে ছুটি নিয়ে নেবে।

দুপুরবেলা বাগানে পৌঁছে নিলয় দেখল কলপাড়ে গামছা পড়ে স্নান করছে শিউলি। এভাবে শিউলিকে সে আগে কখনও দেখেনি। এসময়ে তো আগে আসেনি কখনও। মানসিক চঞ্চলতার কারণেই হয়তো নিলয় সবকিছু ভুলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল শিউলির স্নান করা। ভিতরে ভিতরে একটা তোলপাড় চলছিল তার, খেয়ালই ছিল না যে এভাবে দেখাটা অন্যায়। সম্বিত ফিরল শিউলির চোখে চোখ পড়ায়। দ্রুত চোখ সরিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে সে দেখতে পেল বাগানের পিছনের বাড়ির আধবয়সী লোকটা একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শিউলিদের কলতলার দিকে।

ঘরে চৌকিতে বসে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছিল নিলয়, ভেতরটা তখনও থরথর করে কাঁপছিল তার। মনে মনে ঠিক করছিল কীভাবে কথাটা উত্থাপন করবে শিউলির সামনে। এমন সময় ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল শিউলি। তার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল নিলয়। এভাবে সে আগে কোনোদিন দেখেনি শিউলিকে। ঠিক কাল রাতে স্বপ্নে বা কল্পনায় দেখা মেয়েটির মতো । তফাত শুধু এই, শিউলির সিঁথিতে এখন টকটকে লাল সিঁদুর, কপালে বড় লাল টিপ। নিলয়কে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখেই হয়তো, শিউলি জানতে চাইল—হঠাৎ এই অসময়ে এলেন যে? কিছু দরকার আছে? স্বরে কোনো জড়তা নেই, অভিযোগ নেই, একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার লেশমাত্র আভাস নেই।

নিলয় ভেবেছিল কথা বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাবে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট করেই অকম্পিত কণ্ঠে বাড়ির চাবিটা এগিয়ে ধরে বলল—চাবিটা তোমার কাছে রাখো, আমি কিছুদিন ব্যস্ততার কারণে আসতে পারব না। ঘরদোরগুলো একটু পরিস্কার রেখো, আর—আর, ইয়ে, মানে এ বাড়ির বাথরুমটা তুমি ব্যবহার কোরো, যতদিন না একটা তৈরি করতে পারছ।

বাগানবাড়িটা বেচতে হলেও নিজের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হবে। তার জন্য কিছুদিন সময় প্রয়োজন নিলয়ের। ■

নবাঙ্কুর

শ্রেষ্ঠ দাতা

বহুকাল আগে মহারাজা ব্রহ্মদত্তর সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার খরগোশ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি গ্রামের পাশে পাহাড়ের জঙ্গলে বাস করতেন। সেই বনের একটি বানর, একটি ভোঁদড় ও

একটি শেয়াল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তিন বন্ধু খরগোশের কথা শুনত ও পালন করত। কারণ খরগোশ ছিল খুব বুদ্ধিমান ও ধার্মিক। সে সকলকে ধর্মকথা শোনাত, ভালো কাজ করতে বলত।

খরগোশরূপী বোধিসত্ত্ব একদিন আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন আগামীকাল পূর্ণিমা। তিনি তাঁর তিন বন্ধুকে ডেকে বললেন, শোনো ভাই, আগামীকাল পূর্ণিমার দিন নিষ্ঠার সঙ্গে উপবাস করে যারা দান-ধ্যান করেন তাঁরা তাঁদের পুণ্যকাজের জন্য স্বর্গে যায়। একথা শোনার পর পরদিন ভোঁদড় গেল নদীর তীরে। সেখানে সে দেখল এক জেলে সাতটা মাছ বালি চাপা দিয়ে রেখে আবার জাল নিয়ে মাছ ধরতে জলে নামছে। ভোঁদড় সেই সুযোগে বালি সরিয়ে সাতটা মাছ বের করে খুব নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করল এখানে মাছ কে রেখেছে?

ভোঁদড়ের প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কেউ সেখানে ছিল না। কোনো উত্তর না পেয়ে সাতটি মাছ নিয়ে ভোঁদড় চলে গেল এবং নিজের কুটিরেই রেখে দিল। শেয়াল একই ভাবে এক হাঁড়ি দই জোগার করল। বানর অন্যের গাছ থেকে পাকা আম পেড়ে আনল। এবার তিন বন্ধুই দান-ধ্যান করে ধর্ম লাভের চিন্তা করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব ভাবছেন তিনি তৃণভোজী। তৃণ তো কোনো ব্রাহ্মণের খাবার জিনিস নয়। তিনি যদি কোনো প্রাণী হত্যা করে ব্রাহ্মণকে দান করেন তাহলে তা চরম পাপ ও অধর্ম হবে। মনে মনে তিনি ভাবলেন নিজেকেই খাদ্য হিসেবে কোনো ব্রাহ্মণের কাছে তুলে ধরবেন।

এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র বোধিসত্ত্বের মনের কথা জানতে পেরে স্থির করলেন যে, বোধিসত্ত্ব দাতা হিসেবে কত মহান তা পরীক্ষা করে দেখবেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবরাজ সেই বনে গেলেন। এর পর তিনি ভোঁদড়, বানর ও শেয়ালের কুটিরে গেলেন। প্রত্যেকেই তাদের সংগৃহীত খাবার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করল। দেবরাজ ইন্দ্র কোনো খাবার গ্রহণ না করে বললেন, আগামীকাল এসে তিনি প্রত্যেকের খাবার গ্রহণ করবেন। কিন্তু সৎ উপায়ে সংগৃহীত না হওয়ায় দেবরাজ তা গ্রহণ করেননি।

এরপর ব্রাহ্মণ রূপী দেবরাজ ইন্দ্র খরগোশের জীর্ণ কুটিরে উপস্থিত হলেন। চিৎকার করে বললেন, ভিক্ষে দাও ব্রাহ্মণকে। বোধিসত্ত্ব রূপী খরগোশ তখন বিশ্রাম করছিলেন। ব্রাহ্মণের ডাক শুনেই বলে উঠলেন, আগুন জ্বালান আপনি। আমি প্রস্তুত করছি আপনার আহার্য। ব্রাহ্মণ রূপী ইন্দ্র বললেন, আপনার উদ্দেশ্য ঠিক মতো আমি বুঝতে পারছি না। আগুন জ্বালিয়ে আপনি আমায় কী আহার্য দান করবেন? খরগোশ রূপী বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি আগুনে ঝাঁপ দেব। আপনি আমার ঝলসানো মাংস আহার করবেন। দেবরাজ আগুন জ্বালালেন। বোধিসত্ত্ব রূপী খরগোশ অত্যন্ত বিনম্রভাবে দেবরাজকে প্রণাম করে বললেন আমি যোগবলে আমার প্রাণ বের করে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেব। কারণ তা না হলে আমি নিজেই প্রাণীহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হবো। এই বলে খরগোশ আগুনে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু আগুনে শরীর ঝলসে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি অনুভব করলেন তাঁর শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা।

বোধিসত্ত্ব অবাক হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন—হে ব্রাহ্মণ, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া সত্ত্বেও আমার শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন? দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, আপনার মতো শ্রেষ্ঠ দাতাকে আগুনে পোড়াতে পারে না। ব্রাহ্মণের আহার্যের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও আপনি কুণ্ঠিত হন নাই। আপনার মতো শ্রেষ্ঠ দাতাকে সকলেই মনে রাখবে। আপনি অত্যন্ত মহান। এরপর দেবরাজ ইন্দ্র খরগোশকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

(ছেটোদের জাতকের গল্প থেকে)

ভারতের পথে পথে

যোধপুর

১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দে রাঠোর রাজপুত রাও যোধার হাতে এই শহরের পত্তন হয়। ২৩৬ মিটার উঁচু বেলেপাথরের পাহাড়ে রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর যোধপুর। এখানকার অধিবাসীদে মারোয়াড়ি বলা হয়। এখানকার পর্যটক আকর্ষণ বহুবিধ। সমস্ত বাড়িঘর ও মন্দির ভাস্কর্যমণ্ডিত। গুলাব সাগরের পাড়ে তাল হাতি কা মহল। রাজপ্রাসাদ, কুঞ্জবিহারী মন্দির, মেহেরগড় দুর্গ, গঙ্গাশ্যাম মন্দির, ৮৪ স্তম্ভের নাথ সম্প্রদায়ের মহামন্দির, যশবন্ত থাডা, উমেদ ভবন, মেহেরণগড় দুর্গ, নাগচেনজীর মন্দির দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয়। যোধপুরের আর এক আকর্ষণ তার জলাশয়। বেশ কয়েকটি জলাশয় রয়েছে শহর ঘিরে। বালসমন্দ হ্রদ, কৈলানা হ্রদ ও প্রতাপ সাগরের দৃশ্য নয়নাভিরাম। প্রতিটি হ্রদের পাশে রয়েছে কারকার্যমণ্ডিত মন্দির।

জানো কি?

ভারতে কোন রাজ্যে কত জেলা

- উত্তর প্রদেশ- ৭৫, মধ্যপ্রদেশ- ৫১, মহারাষ্ট্র-৩৬, বিহার- ৩৮, অসম-৩৩, রাজস্থান-৩৩, গুজরাট-৩৩, তামিলনাড়ু-৩২, তেলেঙ্গানা-৩১, কর্ণাটক-৩০, ছত্তিশগড়-২৭,ঝাড়খণ্ড-২৪, জম্মু-কাশ্মীর-২৪, পশ্চিমবঙ্গ-২৩, পঞ্জাব-২২, হরিয়ানা-২২। (ক্রমশ)

ভালো কথা

শালিকছানা

আমাদের বারন্দার ঝুলানো টবে দুটো শালিক বাসা বেঁধে ডিম পেরেছিল। ডিম ফুটে ছানা বের হওয়ার পরদিনই পাশের বাড়ির বেড়াল শালিক দুটোকে খেয়ে ফেলে। আমরা কেউ বুঝতেই পারিনি। দুপুরে মা বলল শালিক দুটো ওদের ছানাকে খাওয়াতে আসছে না যে। বাবা বলল রাস্তায় দুটো শালিক মরে পড়ে আছে দেখলাম। মা বলল বুঝেছি ওদের বেড়ালে মেরে ফেলেছে। তারপরেই বাবা বাজার থেকে পাখির খাবার কিনে আনল। ছটি ছানাই হাঁ করে চিঁ চিঁ করছে। মা জলে গুলে ড্রপারে করে ছানাদের মুখে সেই খাবার দিতে লাগল। ধীরে ধীরে ছানাগুলো বড়ো হলো। এখন উড়তে শিখেছে। নিজে নিজে খেতে শিখেছে। আমাদের বাড়িতেই থাকে। কাউকে দেখে ভয় করে না। বাবা বলে ওরা আমাদের বাড়ির সদস্য।

শ্রেয়সী হালদার, দশমশ্রেণী, পুবারুণ এনটিপিসি, মালদা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

কবরখানা

জয়জিৎ মণ্ডল, নবম শ্রেণী, বসিরহাট, উঃ ২৪ পরগনা।

ঝুমুরবাঈয়ের মৃতদেহ
কবরখানার বুকে,
ওই কবরে অনেক দেহ
ঘুমিয়ে আছে সুখে।
কারোর চাচা, কারোর চাচি,
কারোর আব্বাজান
কারোর আবার প্রিয়জন জড়িয়ে
সাদা থান।

কারোর কবর পাকা বেদী, কারোর
বাঁশে ঘেরা
কারোর কবর হয় যে মনে
প্রেতাত্মার ডেরা।
ঝুমুরবাঈয়ের ঝুমুর বাজে
সবেবরাতে—
অশরীরী আত্মা হাসে
অমাবস্যার রাতে।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা ।। পরীক্ষিৎ ।। ৩০ ।।

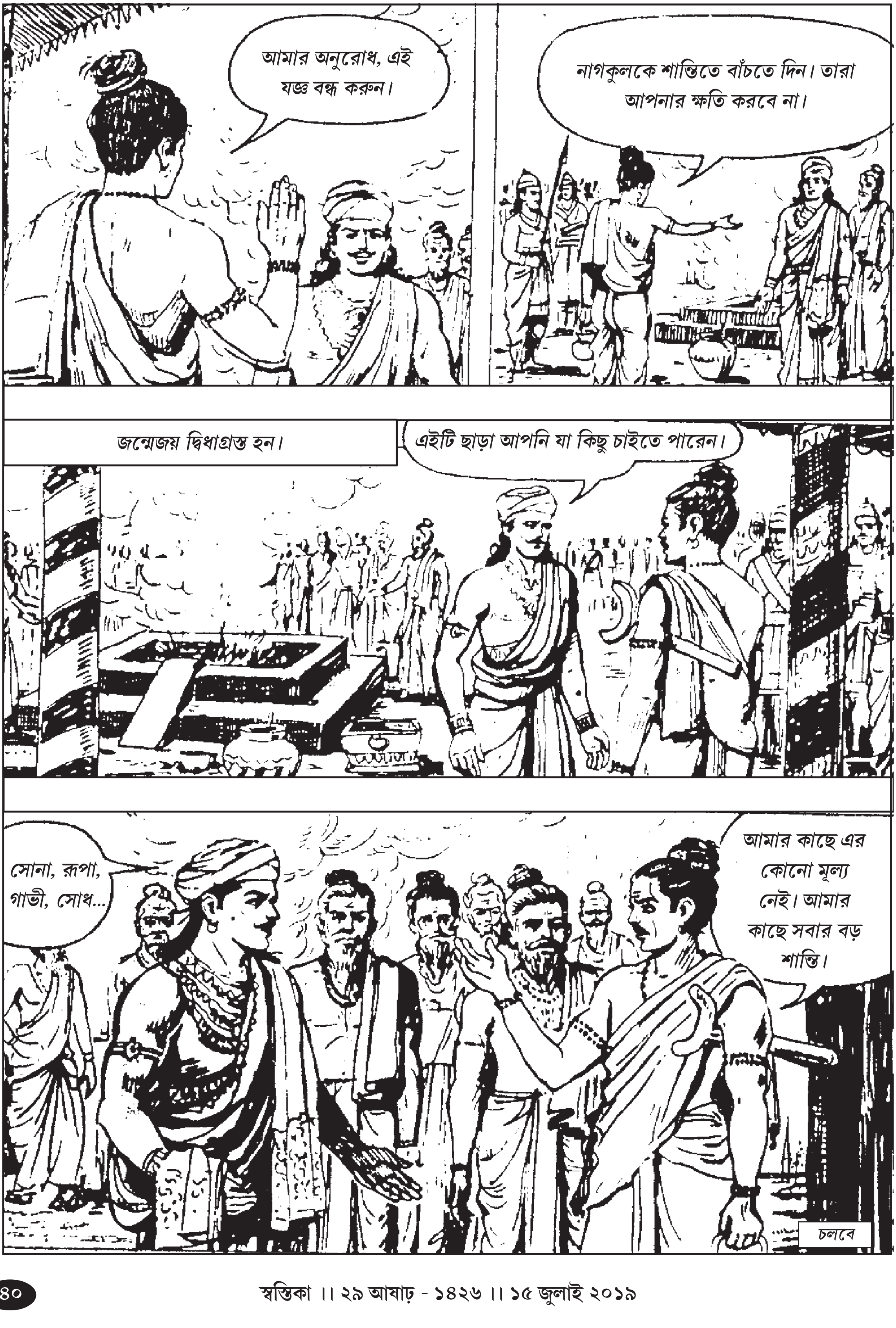

বুদ্ধিজীবীরা ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে হিন্দুবিদ্বেষী

মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ইদানীং এক শ্রেণীর মানুষ হঠাৎই গেল গেল রব তুলে সোচ্চার হয়ে উঠেছে হিন্দুত্ব নিয়ে। এরা নিজেদের মানবতাবাদী তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ উদারচেতা বুদ্ধিজীবী বলে দাবি করেন। সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক পরিধি ছাড়িয়ে এক শ্রেণীর সবজান্তা বিদ্বজ্জন রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছে। এই বোদ্ধাদের জ্ঞানের পরিসীমা নিয়ে সন্দেহ হয়। হিন্দুত্ব নিয়ে তারা উন্নাসিকতা প্রকাশ করে প্রচারের প্রতিযোগিতায় খবরের কাগজের শিরোনামে স্থান পেতে ব্যস্ত। আসলে হিন্দুত্ব নিয়ে বিভ্রান্তির শুরু সংবিধানে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি সংযোজনের পর থেকেই। জেনে রাখা দরকার যে সংবিধান প্রণেতারা কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি কখনো কোথাও উল্লেখ করেননি। এদেশের ইতিহাস বলে ভারত সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে বিশ্বাসী। তাই স্বভাবতই ভারত ধর্মনিরপেক্ষ। হিন্দুত্ব কোনো ধর্ম নয়, এক জীবনপদ্ধতি। প্রকৃত অর্থে হিন্দুত্ব সম্পর্কে না জেনে এই শ্রেণীর লোক ইচ্ছাকৃত ভাবে ধর্মের তকমা লাগিয়ে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ পোষণ করে চলেছে। হিন্দুত্ব নাকি ভারতের বহুমাত্রিকতার উপর আঘাত। এদের অজ্ঞতা প্রথমেই দূর হওয়া উচিত এই জেনে যে, হিন্দু বা হিন্দুত্ব-এর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, যেহেতু এটা কোনো ধর্ম নয়। প্রত্যেক ধর্মের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা আছে। খ্রিস্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আছে। হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা নেই।

বাস্তবিক অর্থে ভারত এমন একটি দেশ যেখানে প্রাচীনকাল থেকেই বহু জাতি মত-পথ ও ধর্মের সমাবেশ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন বহিরাগত আগাসী শক্তি বলপূর্বক এদেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা সত্ত্বেও এক সময় তাদেরকেই আত্মসাৎ করে নিয়ে ভারত এক বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য, সম্প্রীতি ও সমন্বয় সৃষ্টি করেছে যা বিশ্বের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এটা সম্ভব হয়েছে কেবল ভারতের অন্তরাত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি সেই সনাতন ঐক্যের বাণী— বসুধৈব কুটুম্বকম্— 'সমস্ত বিশ্ব এক পরিবার'। বেদ উপনিষদের সেই শিক্ষা সর্বজনীন সুখ ও সমৃদ্ধি কামনাই হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবন শৈলীর মূল সুর। এই 'হিন্দুত্ব'ই সনাতন শাশ্বত ভারতীয় সত্তা যা প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নির্যাস। হিন্দুরা বিশ্বাস

ফাইলচিত্র

করে সব ধর্ম সত্য সর্ব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর উপলব্ধি সম্ভব। ভারত আত্মার এই মূল সুর হলো দেশকে মাতৃভূমি জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও পূজা করা। হিন্দুত্বের ভৌগোলিক বিস্তার এককালে ছিল সুদূর ইরান ও আফগানিস্তান থেকে পূর্বের ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া ফিলিপিন্স এমনকী জাপান-সহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত। যুগ যুগ ধরে এত বহিঃশত্রুর অত্যাচার আগ্রাসনের পরেও হিন্দুত্ব স্বমহিমায় আজও বিরাজমান। কারণ হিন্দুত্ব কাউকে অশ্রদ্ধা করে না, অন্য কোনো ধর্মকে অস্বীকার করে না। ইতিমধ্যে অনেক ধর্মের উদয় ও অবলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু হিন্দুত্ব বিলীন হয়ে যায়নি।

হয়তো অনেকেই অবগত আছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কৃষ্ণনামের প্রসার। পাশ্চাত্যের কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের বেদ মন্ত্র পাঠের প্রচলন আছে। এমনটি এদেশে হলে ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা হৈ হৈ করে উঠবে। যোগী ঋষিদের নির্দেশিত 'যোগ' ক্রিয়া যা আজ বিশ্ব বন্দিত, কিন্তু কী অদ্ভুত পরিহাস, কেউ কেউ এর মধ্যে ধর্মের গন্ধ খুঁজে এক বিশেষ সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করে তার বিরোধিতায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই মুসলমান প্রধান দেশেও হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত জনপ্রিয়। হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতকে বিশ্ব দরবারে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায় বিদগ্ধ মুসলমান সঙ্গীতকারদের। তাহলে 'হিন্দুত্ববাদ'-এর প্রতি এত অনীহা বা বিদ্বেষ কেন— কীসের আতঙ্ক?

রাজনৈতিক স্বার্থ লোলুপ ষড়যন্ত্রের বলি হতে চলেছে বিশ্ব গৌরবান্বিত এই সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত হিন্দুত্ব। এর অস্তিত্বকে বিপন্ন করার জঘন্য ও গভীর চক্রান্ত চলছে। এক শ্রেণীর লোক বিশেষ করে সেই স্বঘোষিত বিদ্বজ্জন বলে যারা নিজেদের জাহির করে, তারা নিজেদের হিন্দু বলতে কুণ্ঠিত বোধ করে কেননা তাহলে যে লোকে সাম্প্রদায়িক বলবে এই আশঙ্কা। এদের যে প্রমাণ করতে হবে এরা সেক্যুলার তা না হলে নিজের বৈশিষ্ট্য যে বজায় থাকে না। একজন হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলে গর্ব করাই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে অনীহা বা দ্বিধা কেন? সেখানেই তো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সুতরাং হিন্দুর সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐহিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার সুরক্ষায় সচেষ্ট হওয়া অপরিহার্য নয় কি? ধর্মের রঙে কেন একে কলুষিত করার চক্রান্ত? কার বা কাদের নির্দেশে ও স্বার্থে এই আতঙ্ক ছড়ানো?

ময়দান ফিরে পাক হারানো গরিমা

অনামিকা দত্ত

বঙ্গ রাজনীতিতে পালা বদলের ইঙ্গিত মেলার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা ময়দান রাজনীতিতেও এবার লাগতে চলেছে পালা বদলের হাওয়া। ময়দানের তথাকথিত বড় ক্লাবগুলো থেকে পাড়ার ক্লাবগুলোতেও শাসক দলের প্রভাব চলছে অবাধ গতিতে। বছরে ২ লক্ষ টাকা অনুদান তো আর হেলা-ফেলা করার মতো ব্যাপার নয়। তার জন্য রাতারাতি ক্লাব তৈরি হয়ে গেল অনেক জায়গায়। সেই ক্লাবগুলো শাসক দলের ঘনিষ্ঠ নেতার প্রভাবিত। তাতে গুনতিতে ক্লাব বাড়ানো গেল আবার ব-কলমে ক্লাব অনুদান দেওয়ার নামে নিজের দলের লোকেদের ছড়িয়ে দেওয়া গেল। যাঁরা পাড়ায় পাড়ায় রীতিমতো অলিখিত প্রতিপত্তি চালাতে লাগলেন। নিয়মের তোয়াক্কা না করে দুর্নীতির বেনোজল প্রবেশ করাতে লাগলেন ক্লাব ও সংস্থাগুলোর অন্দরে। আর একদিকে ময়দানের প্রায় সব ক্লাবগুলোর বা সংস্থাগুলোর শীর্ষপদে বসে পড়লেন মুখ্যমন্ত্রীর দাদা-ভাইরা। কোথাও বা ব-কলমে ক্লাবগুলোর সব কতৃত্বই চলে গেল ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং-এর হাতে। এ ব্যাপারে খুব সম্প্রতি এক বড় ক্লাব নির্বাচনের উদাহরণ টানা যেতে পারে। সেই ক্লাবের শাসন ক্ষমতা কোন দিকে থাকবে এটা বুঝতে এক কর্তার লেগে গিয়েছিল প্রায় মাস চারেক। আসলে ক্লাবের বিবদমান দুই গোষ্ঠীর শীর্ষে ছিলেন আবার শাসক দলের দুই মন্ত্রী। সেই মন্ত্রীদের মধ্যে কে দিদিমণির খুব কাছের এটা বুঝতে ব্যয় করে ফেললেন অনেকটা সময়। আবার যেই না বোঝা অমনি রাতারাতি ডিগবাজি খেয়ে দিদিমণি ঘনিষ্ঠ মন্ত্রীগোষ্ঠীতে নাম লেখালেন। কিন্তু ততদিনে অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

শাসক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার একটা খেলা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে এই রাজ্যে। প্রশাসনের রং পরিবর্তন হলেও খেলা বন্ধ হয়নি। বামজমানায় কোনো কোনো ক্রীড়াসংস্থা বা ক্লাবগুলোর শীর্ষস্থানে যেমন ছিলেন সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বা ক্ষিতি গোস্বামী বা কান্তি গাঙ্গুলিরা পাশাপাশি সুব্রত মুখোপাধ্যায় বা প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি ঘনিষ্ঠ দু-একজন নেতাও ছিলেন শীর্ষস্থানে। এ জমানায় আবার এসবের বালাই নেই। প্রায় সমস্ত সংস্থার ভিতরেই ঢুকে পড়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দাদা-ভাইরা। সর্বত্রই বিরোধীশূন্য করে রাখার এই প্রচেষ্টা ঢুকে পড়েছে ময়দানেও। যে ময়দানকে বলা হয় এখানে কেউ আলাদা নয়, এখানে একটাই মন্ত্র খেলা-ধূলার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠুক সমন্বয়।' তবে এই বিরোধীশূন্য মানসিকতায় ময়দানে লাভের থেকে ক্ষতি হচ্ছে অনেক বেশি। কারণ ঘৃণ্য রাজনীতি আর যাই করুক খেলাধূলার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন পড়ে তা জোগান দিতে পারে না। ক্যাডার তৈরির স্বার্থে বা জনসমর্থন নিজেদের দিকে ধরে রাখতে গেলে বছরে ২ লক্ষ টাকা করে দিতে যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে তা একাধারে যেমন ঘুর পথে জনগণের করের টাকা, তেমনই ২ লক্ষ টাকায় কোনো খেলারই সার্বিক পরিকাঠামো গড়া যায় না। তাই সেই টাকা দিয়ে ক্লাবগুলোকে দিয়ে মেলা বা ফাংশন করানো গেলেও দলগত বা ব্যক্তিগত স্তরে খেলোয়াড় তৈরি করানো যায় না। আর ময়দানের গুটিকয় বড় দল যারা খেলাধুলোর জন্যই জনপ্রিয় তাদের তো আবার এই ২ লক্ষ টাকায় চিড়েও ভেজে না। আবার সরাসরি টাকার জোগান প্রশাসন করে দিতে পারে না। একইভাবে এঁকে, ওঁকে, তাঁকে স্পনসর হিসাবে পেতে গেলেও সমস্যা। কারণ তাঁরা আবার কোন্ দলের ঘনিষ্ঠ সেটা বুঝে তবেই মাঝে মধ্যে স্পনসর মেলে। আর এভাবে দীর্ঘদিন চলে আসতে আসতে ময়দানের বাকি ক্লাবগুলো নিজেদের অজান্তেই অবক্ষয়ের পথে পা দিয়ে ফেলেছে। প্রতিষ্ঠিত ২ বা ১টি ক্লাব ছাড়া কারো সেভাবে স্পনসর নেই, আবার একইভাবে সব ক্লাবে গৌরী সেনও নেই, যাঁরা শুধুমাত্র শখ মেটাতে টাকা ঢেলে যাবেন দিনের পর দিন। ময়দানের ইতিউতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্লাবগুলো প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। সেখানে মুষ্টিমেয় কর্মকর্তারা আড্ডার আসর বসালেও খেলাধুলো প্রায় বন্ধ হবার পথে। অনেক ক্লাবই ময়দানের মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ঠিকই তবে বাজি ধরে একথা বলা যায় তাদের কেউই স্বচ্ছন্দে নেই। এমনই এক ক্লাবের কর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলছিলেন সবার তো আর প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ক্ষমতা নেই তাই তারা আজ ব্রাত্য। ক্রীড়া সংস্থাগুলোরও প্রায় একই হাল। কোথা থেকে আসবে টাকা? কে করবে সঠিক পরিকল্পনা? কিছু কর্মকর্তা আবার এরই মাঝে ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছেন। অনেকে আবার ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো অবস্থান করছেন। হাওয়া বুঝে জ্বলে উঠবেন। কেউ কেউ আবার আশায় বুক বাঁধছেন, কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখা বিজেপি রাজ্যেও যথেষ্ঠ ভালো ফল করায়। তাদের আশা যদি এমন কোনো ক্রীড়াপ্রেমী নেতা এসে হাল ধরেন ময়দানের। বর্তমান রাজনীতির গতি-প্রকৃতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছেন কেউ কেউ। তবে এটুকু হলপ করে বলা যায় এদের বেশির ভাগই সুবিধাবাদী। পরিশেষে একটা কথা বলতে হবে, যদি সত্যিই কোনো পরিবর্তন হয়, তাঁরা যেন ৫০, ৬০ বা ৭০ দশকের মতো প্রকৃত ক্রীড়া-প্রেমীদের এই সব জায়গার শীর্ষে নিয়ে আসেন। এমন কোনো ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দেওয়া হোক ব্যাটন, যাতে তাঁদের হাত ধরেই ময়দান ফিরে পায়া হারানো গরিমা। ▮

আন্তর্জাতিক

শ্রীলঙ্কায় জঙ্গি হামলা এবং বিদ্যমান ভারতীয় পরিস্থিতি

জ্যোতি প্রকাশ চ্যাটার্জি

কিছুদিন আগে শান্তিকামী ভারতের প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা যে ভয়াবহ জঙ্গিহামলার সাক্ষী থেকেছে তাতে গোটা বিশ্ব বাকরুদ্ধ ও স্তম্ভিত। ব্যাপারটা নিয়ে পশ্চিমি দেশগুলিতে হইচই পড়ে যায়। বেশি হইচইয়ের কারণ হচ্ছে শ্রীলঙ্কা যে ইসলামিক জঙ্গিহামলার শিকার হয়েছে তাতে বলি হতে হয়েছে শ্রীলঙ্কায় বসবাসরত খ্রিস্টান সম্প্রদায় এবং তাদের উপাসনাস্থল গির্জা। স্বাভাবিক কারণেই পশ্চিমি দেশগুলি তো হইচই করবেই, কারণ তারা খ্রিস্টান এবং শ্রীলঙ্কায় হামলার শিকার হয়েছে খ্রিস্টানরা।

এই প্রসঙ্গে কিছু ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। ২০১৮ সালে শ্রীলঙ্কা সাক্ষী থেকেছিল ভয়াবহ এক দাঙ্গার। ঘটনাটির সূত্রপাত হয় যখন মধ্যবয়সী এক সিংহলী ট্রাক চালককে কিছু মুসলমান যুবক প্রকাশ্য দিবালাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার অপরাধ ছিল এটাই যে তার কারণে একটি মামুলি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। আসলে ঘটনাটি ছিল পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ বিগত দশকে শ্রীলঙ্কার মূল সংস্কৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। শ্রীলঙ্কায় মুসলমানদের উপর বাড়তে থাকে আরব্য সংস্কৃতির প্রভাব। যেমন ব্যাঙের ছাতার মতো এখানে ওখানে গজাতে শুরু করে মসজিদ যার অর্থ আসে মূলত আরব দেশগুলি থেকে। তাছাড়া মুসলমান মেয়েদের মধ্যেও বাড়তে থাকে আরব সংস্কৃতির প্রভাব। যেমন— বুরকা বা নিকাব পরিধান করা। পালা করে বাড়তে থাকে বিরিয়ানির দোকান। এই সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ আবশ্যক। ২০১৮ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার আমপাড়া শহরে কিছু বৌদ্ধ যুবক সান্ধ্যভোজনের জন্য একটি রেস্তোরায় যায়। খাওয়ার সময় তারা খাবারের ভিতরে কিছু ট্যাবলেট জাতীয় পদার্থ দেখতে পায়। পরে জানতে পারা যায় ওই ট্যাবলেট জাতীয় পদার্থ আসলে নির্বীজন বা sterilisation Pill পরে চাপের মুখে পড়ে ওই রেস্তোরার মালিক স্বীকার করে নেয় যে পূর্বকল্পিত ভাবে স্থানীয় সিংহলী বৌদ্ধ যুবকদের নপুংসক বা পুরুষত্বহীন করে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা এই ধরনের কাজে লিপ্ত ছিল। এটা তো গেল ২০১৮ সালের ঘটনা। ২০১৪ সালেও একই রকমের ঘটনা ঘটে। ১২ জুন ২০১৪ সালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আয়াগামা সামিথা এবং তার গাড়ির চালককে কিছু মুসলমান যুবক বিনা কারণে শারীরিকভাবে প্রচণ্ড প্রহার করে। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন শ্রীলঙ্কায় হয়তো মুসলমানদের সংখ্যা যথেষ্ট সেইজন্য তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে মারধর করার সাহস পায়। তাহলে দেখে নেওয়া যাক শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ এবং মুসলমান শতাংশের হিসেবে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে। ২০০৯ সালের গণনা অনুযায়ী শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ (৭০.২ শতাংশ) হিন্দু (১২.৬ শতাংশ); মুসলমান (৯ শতাংশ) এবং খ্রিস্টান (৬.১ শতাংশ)। পরিসংখ্যানগুলো থেকে স্পষ্ট যে শতাংশের হিসেবে মুসলমানদের অবস্থান খুবই নগণ্য। তাহলে সত্তর শতাংশ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উপরে আক্রমণ হচ্ছে কীভাবে যেখানে আক্রমণকারী মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য। শতকরা হিসেবে মুসলমানদের থেকে তো হিন্দুদের সংখ্যা বেশি। তাহলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে না কেন? কারণটা হচ্ছে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুটি ধর্মেরই মূল ভিত্তি হচ্ছে শান্তি এবং আত্মোন্নতি। দুটো ধর্মেই অসহিষ্ণুতার কোনো জায়গা নেই। সেই ঘটনার পরে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে বোদু বালা সেনা (BBS) নামে একটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়। যে সংগঠনের মূল কাজ হলো বৌদ্ধ সংস্কৃতি রক্ষা করা। বোদু বালা সেনার কারণে আজ শ্রীলঙ্কায় ধর্মান্তরকরণ বহু অংশে কমে গিয়েছে, আরব দেশগুলি থেকে অর্থ আসার পরিমাণও কমে গিয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির শক্তিক্ষয় হয়েছে। বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির একটি ব্লক তৈরি হয়েছে। কোনো বৌদ্ধ দেশ হিংসার শিকার হলে অন্য বৌদ্ধ দেশগুলি তার পাশে দাঁড়াচ্ছে। দুঃখজনকভাবে হিন্দুদের জন্য কথা বলার মতো কোনো ব্লক অথবা দেশ নেই। আশাব্যঞ্জকভাবে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে হিন্দুদের জন্য নতুন রাস্তা খুলে যায়। যদিও এই রাস্তার ইট পেতেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ার। আমরা দেখেছি পাকিস্তানের আসিয়া বিবি নামে খ্রিস্টান মহিলার জন্য পশ্চিমি দেশগুলো কীভাবে সরব হয়েছিল। কিন্তু ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন যার সাম্প্রতিক সংযোজন হচ্ছে বাংলাদেশে হিন্দু নেতা পলাশ রায়কে জেলের মধ্য পেট্রোল দিয়ে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা— এর বিরুদ্ধে কথা বলার মতো মানুষ সংখ্যায় খুব কম। ■

সংবিধানের ৩৭০ ধারা এবং এর প্রকৃত সাংবিধানিক মর্যাদা

বিমল শঙ্কর নন্দ

এ বছরের ২৮ জুন জম্মু-কাশ্মীরকে নিয়ে ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় যে আলোচনা হলো তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কাশ্মীরকে নিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকার আগামী পাঁচ বছর কোন পথে হাঁটতে চলেছে তার একটা আভাস পাওয়া গেল এই বিতর্কে। বিশেষত সংবিধানের ৩৭০ ধারা সম্পর্কে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির নীতি এবং কর্মসূচির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'এক দেশ এক আইন নীতি'। এই নীতিকে অনুসরণ করেই বিজেপি সংবিধানের ৩৭০ ধারার অবলুপ্তি চেয়েছে প্রথম থেকেই। জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংগ্রাম এবং আত্মবলিদানের প্রধান কারণই ছিল কাশ্মীরের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিরোধিতা এবং এর অবলুপ্তির দাবি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে দিল্লির ক্ষমতায় দ্বিতীয়বারের জন্য অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সকলের তাই আগ্রহ ছিল ৩৭০ ধারা নিয়ে কেন্দ্রের নীতি এবার কোন পথে চলবে। অমিত শাহের বক্তব্যে তারও আভাস পাওয়া গেল। ৩৭০ ধারা নিয়ে এবার সত্যিই নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হবে। সমগ্র দেশ এগোচ্ছে 'এক দেশ এক সংবিধান'-এর পথেই। এই প্রসঙ্গেই নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে সংবিধানের ৩৭০ ধারাটিকে নিয়ে। এই ধারাটির প্রকৃত সাংবিধানিক মর্যাদা, এর গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে। কাশ্মীরের এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা বাদ দেওয়া যায়, কারণ ৩৭০ ধারা তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু এদেশের 'বাম-কংগ্রেস ব্যবস্থা'-র ফসল বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশও যেভাবে ৩৭০ ধারাকে প্রায় একটি চিরন্তন সাংবিধানিক ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন তার বাস্তবতা কতটুকু? সংবিধানের একটি বিশেষ ব্যবস্থা কখনো অলঙ্ঘনীয়, চিরন্তন হতে পারে? আজ তারই উত্তর খুঁজবো।

১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবর ইন্সট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্ত হয়। তা না হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে জম্মু-কাশ্মীরকে রক্ষা করতে হস্তক্ষেপ করা সদ্য স্বাধীন ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর হানাদার বাহিনীর হাত থেকে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করা প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতে যোগ না দিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা মহারাজা হরি সিংহের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। একারণেই হরি সিংহের ভারতভুক্তির সিদ্ধান্ত এবং একারণেই ১৯৪৭ সালের ২৬ অক্টোবরের সেই বহু আলোচিত 'The Instrument of Accession of Jammu and Kashmir to India.' এই প্রেক্ষপটেই সংবিধানের ৩৭০ ধারাকে নিয়ে আলোচনাটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধানের ২১তম অংশে নিহিত এই ধারা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য কতগুলি বিশেষ সুবিধার বন্দোবস্ত রেখেছে। যেমন :

প্রথমত, ভারতের 'পার্টি বি' রাজ্যগুলির জন্য সৃষ্ট সংবিধানের ২৩৮ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য প্রযোজ্য ছিল না, যদিও ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী কার্যকরী হওয়া ভারতীয় সংবিধানে জম্মু ও কাশ্মীর 'পার্টি বি' ভুক্ত একটি রাজ্য ছিল। ১৯৫৬ সালে সংবিধানের সপ্তম সংশোধনীর পর এই ধারটির আর অস্তিত্ব নেই। দ্বিতীয়ত ৩৭০ ধারা অনুযায়ী জম্মু ও কাশ্মীর বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা সেই সমস্ত কেন্দ্রীয় এবং যুগ্ম তালিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ যা Instrument of Accession-এ সুনির্দিষ্ট করা আছে। তৃতীয়ত, ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারা (সেখানে ভারতকে একটি 'union of state' বলে ঘোষণা করা হয়েছে) এবং ৩৭০ ধারা জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অন্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে যেমন কেবল সংবিধানের ১নং ধারাটি প্রযোজ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ১নং ধারার সঙ্গে ৩৭০ ধারাটিও প্রযোজ্য। চতুর্থত, উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও সংবিধানের অন্যান্য ধারাগুলি কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে যদি ভারতের রাষ্ট্রপতি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদের সম্মতিসাপেক্ষে তা প্রয়োগ করেন। পঞ্চমত, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভারতের রাষ্ট্রপতি এই সঙ্গে ঘোষণা করতে পারেন যে, ৩৭০ ধারাটি 'কার্যকরী করা হবে না' (ceses to be operative) কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে এবং সংশোধিত উপায়ে প্রয়োগ করা হবে (operates with exceptions and modifications)। রাষ্ট্রপতি কেবল রাজ্যের Constituent Assembley-এর পরামর্শ অনুযায়ী তা করতে পারেন।

এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সঙ্গে সংবিধানের ৩৭০ ধারাটির প্রত্যক্ষ যোগ থাকলেও এই ধারাটিকে কখনোই চিরন্তন কিংবা অপরিবর্তনীয় ভাবা হয়নি। তা যদি ভাবা হতো তবে এই ধারা কার্যকরী না করা কিংবা 'ক্ষেত্রবিশেষে এবং সংশোধিত উপায়ে প্রয়োগ করা'— এই ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে রাখা হতো না। সর্বোপরি সংবিধানের ৩৭০ ধারাটিকে রাখা হয়েছে ২১তম অংশে যা সংবিধান অনুযায়ী টেম্পুরারি বা অস্থায়ী transitional বা পরিবর্তনশীল এবং special বা বিশেষ। ৩৭০ ধারাটিকে স্থায়ী হিসেবে যদি কল্পনা করা হতো তবে কখনোই তাকে ২১তম অংশের অস্থায়ী পরিবর্তনশীল, বিশেষ ব্যবস্থাগুলির অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ৩৭০ ধারাটিকে কখনোই ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তার একাধিক রায়ে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অপরিবর্তনীয় নিয়ে যে মত প্রকাশ করেছেন এবং সংবিধানের যে অংশগুলোকে তার অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে ৩৭০ ধারা তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩৭০ ধারা ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায়ে। কিন্তু ইতিহাস স্থিতিশীল নয়। ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার গতিশীলতা একবিংশ শতকে গোটা বিশ্বের সমীহ আদায় করছে এক শক্তিশালী ভারত। ঐক্যবদ্ধ দেশই হয় শক্তিশালী দেশ। সেখানে দেশের মধ্যেই এক ধরনের অনৈক্যের ভাবনা জন্ম দেয় যে ধারা তাকে আর কতদিন বয়ে চলা হবে সে নিয়ে ভাবনারও সময় এসেছে। ৩৭০ ধারাকে হাতিয়ার করে কিছু সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দল তাদের 'খেলা' চালিয়ে যাবে সেটা দেশের মানুষের পক্ষে আর বেশিদিন মেনে নেওয়া সম্ভব হবে না। ■

দেশ ও জাতির জন্য চাই যুব সমাজ

চন্দন রায়

'এখন যৌবন যার
যুদ্ধে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার'

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে জাতির যুব সমাজ বা যুবশক্তি নিজ জাতি সমাজ ও সভ্যতার পরম্পরা ঐতিহ্য দর্শন ও সংস্কৃতির ব্যাপারে উদাসীন মূল্যবোধহীন এবং ঘুমন্ত, সে জাতির ভাগ্যাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, প্রাচীন সভ্যতার ক্রমবিকাশ রহিত ও স্তব্ধ। মূলধারা বা উৎস থেকে ছিন্ন নদী যেমন গতিপথ হারিয়ে শুকিয়ে যায় সমুদ্রের জলরাশির অসীমতায় পৌঁছানোর আগেই, তেমনই লক্ষ্যশূন্য ঘুমন্ত জাতিও বিলীন হয়ে যায়। একই কারণে সক্রেটিস, প্লুটো, অ্যারিস্টটলের মতো দিকপাল দার্শনিকের দেশ প্রাচীন গ্রিস, রোমান, মেসোপটেমিয়া, মিশরীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও সমাজ ইতিহাসের অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে গেছে। ওই সমস্ত দেশের সমকালীন যুবসমাজের পূর্বসূরীদের নির্মিত ঐতিহ্যের প্রতি মূল্যবোধহীনতা, উদাসীনতা পরিপূর্ণ ভাবে দায়ী। আমাদের নিকটতম পারস্য সাম্রাজ্য ও পার্সি জাতি, গান্ধার পর্বতবাসীর নিজস্ব সমৃদ্ধিশালী সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস যুবসমাজের ভ্রান্ত ও বিপথগামিতার কারণে আজ পৃথিবীর মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে।

যুগে যুগে আমাদের দেবভূমি ভারতবর্ষও এরূপ বিপদ ও বিপর্যয় থেকে মুক্ত ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই সনাতন ধারার দর্শন সংস্কৃতি ও ঋষিকুলের সাধনালব্ধ পরম্পরার উপর বারবার আঘাত এসেছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরাচারী ধর্মীয় মতবাদ : ছলে বলে কৌশলে বহিঃ ও বিপথগামী অন্ত:শক্তি সমৃদ্ধিশালী বলিষ্ঠ ভারতীয় পরম্পরা ও সংস্কৃতি ধ্বংসে লিপ্ত হয়েছে এবং যুগে যুগে সাময়িক আংশিক সফলকাম হয়েছে।

এই বিপর্যয় থেকে ভারতমাতার সুসন্তান চেতনশীল স্বজাত্য অভিমান ও গরিমায় উদ্বুদ্ধ সাহসী যুব সমাজ শত অত্যাচার মোকাবিলা করে ভারতীয় পরম্পরা, সংস্কৃতি ও সমাজ রক্ষা করেছে। ভারতীয় সমাজের সনাতন ধারা পুনরায় স্বগৌরবে স্বমহিমায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বারে বারে যুবসমাজ নিজস্ব পরম্পরা ও সংস্কৃতি বিরোধী শক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে নিজ সমাজের উপর তাণ্ডব চালিয়েছে। দেবস্থান ও দেবমূর্তি ভেঙে ধ্বংস করেছে আবার সেই যুব সমাজই ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবন বোধ ও মূল্যবোধের শিক্ষা নিয়ে ভাঙা মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছে। এটাই আমাদের অন্তর্নিহিত সঞ্জীবনী শক্তি ও গর্ব। তাই আমরা গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি সেই যুগশ্রেষ্ঠ যুব সন্তানদের যারা ঋষিবাণী পাথেয় করে সামাজিক বিপর্যয়ে জয়ী হয়েছে। নিত্য স্মরণীয় যুব শক্তির প্রতীক আদি শঙ্করাচার্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ সবাই সমকালীন যুব সমাজের মধ্যে ভারতীয় মূল্যবোধ, স্বজাত্য অভিমান ও আত্মশক্তির স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে নব জাগরণ গড়ে তুলে ভারতবর্ষের পরম্পরা ও সংস্কৃতি রক্ষা করেছে।

ভারতমাতার শৃঙ্খল ও দেবভূমির পরাধীনতা মোচনের সংগ্রামে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মাস্টারদা সূর্য সেন, ঋষি অরবিন্দ যুবশক্তির মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাবোধ জাগিয়ে যুবসমাজকে সংগঠিত করে মরণপণ লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ঠিক একইভাবে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্বাধীনতার শেষ লগ্নে স্বার্থান্বেষী দুষ্ট দেশি-বিদেশি ভারত বিরোধী চক্রের বিরুদ্ধে মহান শিক্ষাব্রত ছেড়ে দেশভক্ত যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমে পড়েন। এক দেশ, এক নিশান, এক বিধানের প্রতিষ্ঠায় আপোশহীন লড়াই করে জীবন বলিদান করেছেন। তখনও দেশভক্ত যুবসমাজই ছিল তাঁর প্রধান শক্তি।

আজও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সেই লড়াই কোটি কোটি দেশভক্ত যুবসমাজ পরম্পরাগতভাবে বহন করে চলেছে। ভারতের জাতীয়তাবাদী যুবসমাজ সেই কঠিন সংগ্রামের সহযোদ্ধা। তাদের ধমনীতে ঋষিদের রক্ত। এই রক্ত কোনোদিন পরাভব মানে না। তারা করেছি পণ জিততে হবে একদিন।

আজ ভারতে দেশপ্রেমী দেশভক্ত সরকারের নেতৃত্বে উন্নয়ন ও বিকাশের মহা কর্মযজ্ঞ চলেছে। কবির স্বপ্নের বাণী 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'-এর দোরগোড়ায়। একসময় ভারত বিরোধী বহিঃ ও আন্তঃ শক্তি তথাকথিত রাজপ্রসাদভোগী বুদ্ধিজীবী প্রচারমাধ্যম রাজ্যে রাজ্যে পরিবারতন্ত্রী অসাধু ব্যক্তিস্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল জোট বেঁধে দেশের পবিত্র পরিবেশকে অপবিত্র করে তুলেছে। মাদকাসক্তি, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, তোলাবাজি, গুন্ডামি, ভোট সন্ত্রাস ইত্যাদি অনৈতিক কাজে লিপ্ত হয়ে দলদাসে পরিণত হয়েছে। ভারত বিরোধী শক্তির প্রভাবে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়ে সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি দেশ ও সমাজ বিরোধী চক্রান্তের শিকার হয়েছে। সনাতন শ্রেষ্ঠ জীবনবোধ তাদের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই দেশের এই সঙ্কট মুহূর্তে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ ও স্বপ্নে বিভোর জাতীয়তাবাদী যুবসমাজ জেগে উঠেছে। শুরু হয়েছে কর্মযজ্ঞ নতুন ভারত গড়ার। স্বামী বিবেকানন্দ তো এরকম যুব সমাজই চেয়েছিলেন। ■

সংবাদ প্রতিবেদন

বার্ষিক ৪০০ কোটি লেনদেনে কর্পোরেট ট্যাক্স দিতে হবে ২৫ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০১৯-২০ কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রস্তাব করা হয়েছে, যেসব কোম্পানির বার্ষিক লেনদেন ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে, তারা কর্পোরেট ট্যাক্সের ন্যূনতম স্তর ২৫ শতাংশের সুবিধা পাবে। বর্তমানে যেসব কোম্পানির বার্ষিক লেনদেন ২৫০ কোটি টাকার মধ্যে সেইসব কোম্পানিগুলি এই সুবিধা পেয়ে থাকে। সংসদে সাধারণ বাজেট ২০১৯-২০ পেশ করার সময় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন বলেন, এর ফলে ৯৯.৩ শতাংশ কোম্পনি এই করের এই আওতায় আসবে। বর্তমানে মাত্র ০.৭ শতাংশ কোম্পানি এই করের আওতার বাইরে থাকবে।

প্যান-আধারের আন্তঃপরিবর্তনের প্রস্তাব : বাজেটে প্যান এবং আধারের আন্তঃপবির্তনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে যাদের প্যান নেই তাঁরা আধার দিয়ে আয়কর দাখিল করতে পারবেন।

আয়করের প্রাক্-দাখিলের সুযোগ : অর্থমন্ত্রী বলেন, করদাতাদের বিস্তারিত আয়, সিকিউরিটির থেকে মূলধন লাভ, ব্যাঙ্কের সুদ এবং শেয়ার ডিভিডেন্ডের ওপর ভিত্তি করে দাখিলের পূর্বে করের বিস্তারিত পরিমাণ জানা যাবে। তিনি বলেন, ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, মিউচুয়াল ফান্ড, ইপিএফও ইত্যাদির সূত্র থেকে এই তথ্যগুলি পাওয়া যাবে।

অবাঞ্ছিত প্রক্রিয়া দূরীকরণে ই-অ্যাসেসমেন্ট : অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে বলেন, বর্তমান ব্যবস্থার কর নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় করদাতা এবং আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্তরে মতবিনিময় করা হয়। এর ফলে আয়কর বিভাগে আধিকারিকরা কিছু অবাঞ্ছিত কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েন। এই ঘটনাগুলিকে বন্ধ করতে এবং প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা অনুযায়ী বৈদ্যুতিন প্রক্রিয়ায় করের মূল্যায়ণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।

ডিজিটাল পেমেন্টকে উৎসাহ দিতে নানা ব্যবস্থা : জেটে প্রস্তাব করা হয়েছে বছরে নগদে ১ কোটি টাকার বেশি একটি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা হলে টিডিএস ২ শতাংশ বেশি দিতে হবে। এছাড়া ভীম ইউপিআই, ইউপিআই-কিউআর কোড, আধার পে, নির্দিষ্ট কিছু ডেবিট কার্ড, এনইএফটি, আরটিজিএস-এর মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি (যাদের বার্ষিক লেনদেন ৫০ কোটি টাকার বেশি) ডিজিটাল লেনদেন করবে। আরবিআই এবং ব্যাঙ্কগুলি এই ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যে ব্যয় হবে, তার জন্য কোনও অর্থ নেবে না।

সরলীকরণ এবং ইজ অব লিভিং : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ২০১৭ সালের নিরিখে দেশে ইজ অব ডুয়িং বিজনেস অর্থাৎ সহজে ব্যবসা করার নিরিখে ভারত ১৭২ তম স্থানে ছিল। ২০১৯ সালে তা এগিয়ে এসে ১২১এ পৌঁছেছে। করদাতাদের সুবিধার্থে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এই অগ্রগিত সম্ভব হয়েছে। এই বাজেটে করদাতাদের সুবিধার্থে নানা প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কমন ফেসিলিটি সেন্টার গঠন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন জানিয়েছেন চিরাচরিত ঐতিহ্যশালী শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং উৎসাহদানের লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল ঐতিহ্যবাহী শিল্পগুলির বিকাশ ও পুনরুজ্জীবন তহবিল বা এসএফইউআরটিআই প্রকল্পের আওতায় সরকার আরও কমন ফেসিলিটি সেন্টার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংসদে ২০১৯-২০ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে তিনি বলেন, এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ যেমন সৃষ্টি হবে, পাশাপাশি চিরাচরিত ঐতিহ্যশালী শিল্প এবং শিল্পোদ্যোগে উৎসাহ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্প (এএসপিআইআরই)-এর আওতায় প্রাণীপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়া হবে। গ্রামীণ কৃষিজ শিল্পক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে৭৫ হাজার দক্ষ শিল্পোদ্যোগী গড়ে তুলতে এই প্রকল্প সহায়ক হবে। অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় মৎস্য পালন মন্ত্রক, মাছ চাষের ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের সহায়তা করবে। পরিকাঠামো তৈরি, আধুনিকীকরণ, উৎপাদন, গুণগতমান বজায় রাখার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মৎস্য পালনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের এই যোজনার আওতায় সহায়তা করা হবে। কৃষিক্ষেত্রে পরিকাঠামো আরও বিনিয়োগের লক্ষ্যে সরকারের অঙ্গিকারের কথা বাজেট ভাষণে উল্লেখ করে শ্রীমতী সীতারমন বলেন, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের অংশগ্রহণ বাড়াতে বাঁশ এবং কাঠের মতো উৎপাদনে সরকার সাহায্য করবে। তিনি বলেন, অন্নদাতারা শক্তিদাতাও হতে পারেন। আগামী ৫ বছরে কৃষকদের কল্যাণে ১০ হাজারটি সংগঠন স্থাপনের কথা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিকের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রক জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের মাধ্যমে ২০২০ টোকিয়ো অলিম্পিকের জন্য খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ এবং পদক জয়ের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। টার্গেট অলিম্পিক পোডিয়াম স্কিম (টিএপিএস) প্রকল্পের মাধ্যমে এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের। প্রতি মাসে এই প্রকল্পে প্রস্তুতির জন্য ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের ৫০ হাজার টাকা করে প্রদান

করা হচ্ছে। মন্ত্রকের অধীনে থাকা স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া (এস এ আই) ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের প্রস্তুতির জন্য বিদেশি কোচ বা প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। ভারতের প্রশিক্ষকের দক্ষতা, জ্ঞান যাতে বৃদ্ধি পায়, তার জন্য বিদেশি প্রশিক্ষকের সঙ্গে চুক্তিও করা হয়েছে। ব্যাটমিন্টন, হকি, সাঁতার, কুস্তি, দৌড়, টেবল টেনিস, শ্যুটিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদেশি কোচ নিয়োগ করা হয়েছে। অলিম্পিকের মতো যে কোনো আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের নিলামের জন্য ভারতের অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ) দায়বদ্ধ। তবে এর জন্য আইওএ-কে সরকারের কাছ থেকে নির্দিষ্ট অনুমতিপত্র নিতে হয়। এখনও পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য আইওএ-র তরফ থেকে কোনো প্রস্তাব আসেনি। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানান কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

বৈদেশিক মুদ্রায় ভারতের আয় সন্তোষজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন সংসদে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করেছেন।

আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার আয় যথেষ্ট সন্তোষজনক। যদিও ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বর্তমান আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ১.৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২.১ শতাংশ। এর ফলে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ঘাটতি যেখানে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ছিল ৬ শতাংশ তা ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে বেড়ে হয়েছে ৬.৭ শতাংশ। চলতি অর্থবর্ষে অশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে এই বাণিজ্যিক ঘাটতি ঘটেছে বলে আর্থিক সমীক্ষায় জানানো হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে দেশে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। বর্তমানে আর্থিক ঘাটতি কমাতে আরও বিদেশি বিনিয়োগের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে দেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হয়েছে ৩৩০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য, মূল্যবান ধাতু, ওযুধ, সোনা ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের রপ্তানি বেড়েছে।

পরিবেশ রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সময়োপযোগী ভাবনাগুচ্ছ। এইসব ভাবনা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। পরিবেশ রক্ষায় সম্প্রতি এমনই এক আকর্ষণীয় ভাবনা উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটার পেজে গুজরাটের সৌরাষ্ট্রের একটি স্কুলের গল্প বলেছেন। গুজরাটে মারাত্মক জলের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করে স্কুলটি একটি সুবিশাল বাগান তৈরি করেছে। সুপরিকল্পিত বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে কীভাবে পরিবেশ রক্ষা এবং জল সংরক্ষণ সম্ভব তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name : **AXIS Bank Ltd.**
Branch : **Shakespeare Sarani, Kolkata**

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গঙ্গায় সুড়ঙ্গের কাজ বিশ্বে সম্প্রচার করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ বিশ্ব প্রসিদ্ধ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল সম্প্রতি কলকাতা-হাওড়া সংযোগকারী ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রকাশ করেছে।

'Extreme Engineering : on Land & Sea' শীর্ষক তথ্যচিত্রটিতে কলকাতা মহানগরীর এই সর্ব বৃহৎ পরিকাঠামো

প্রকল্পকে দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফলিত রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রকল্পের রূপায়ণের ফলে ভারতের সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে বলে আশা প্রকাশও করা হয়েছে।

তথ্যচিত্রটি হাওড়া ও কলকাতার মধ্যে সংযোগকারী গঙ্গানদীর তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে যোগাযোগ তৈরির কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃশ্যায়ন ও ভাষ্য সংবলিত। কলকাতা ও হাওড়ার মতো বিপুল জনবহুল দুটি শহরে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ হাওড়া সেতু ব্যবহার করেন। সারা ভারতেই নদীর তলদেশ দিয়ে ট্রেন চালানোর এই প্রকল্প সর্বপ্রথম। কলকাতার মতো জনবহুল শহরে নিঃসন্দেহে তা অভিনব। তথ্যচিত্রটি গণ পরিবহণ ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনাকারী ভারতের এই বিশাল প্রকল্পটির ভূয়সী প্রশংসায় ভরা।

সম্পূর্ণ অবস্থায় অন্যান্য আরও বহু মেট্রো লাইনের সঙ্গে যুক্ত গঙ্গার তলদেশগামী এই প্রকল্পকে বাস্তুকারদের আধুনিক পৃথিবীকে এক আশ্চর্য কর্মকাণ্ড উপহার দেওয়ার কারণে অভিবাদন জানানোও বাদ পড়েনি।

এই সূত্রে অন্যতম নির্মাণকারী সংস্থা Afcon-এর জেনারেল ম্যানেজার এস এন কানওয়ার এই ঐতিহাসিক প্রকল্পের নির্মাণ কাজে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর গর্বের কথা বলেছেন। কলকাতার Esplenade থেকে হাওড়া ময়দান অবধি ৩.৫ কিলো মিটার পথের (মূলত গঙ্গবক্ষে) নির্মাণ কাজে সফলভাবে অংশ নেওয়াকে তিনি তাঁর সারা জীবনের সেরা কীর্তি বলে নিজেই আখ্যা দেন। যদিও পাতাল গঙ্গায় নামার সৌভাগ্য এখনও দূরঅস্ত বলেই খবর।

‘জমজম’-এর জল আনা নিয়ে গাজোয়ারি করছে হাজিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কয়েকদিন আগে এয়ার ইন্ডিয়া বিমান সংস্থার জেড্ডা অফিস থেকে এক জরুরি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মক্কা থেকে হজ করে ফেরা মুসলমান যাত্রীদের সঙ্গে ‘জম জম’-এর জলে আনার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এ যাবৎ সমস্ত হজযাত্রীই ফেরার পথে কম করে ৫ লিটার এই জল সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারতেন।

বিমান সংস্থার তরফে বিমানের মাপে পরিবর্তন ও ‘জম জম’-এর জলের দরুন জায়গা দখল করে রাখার কারণে আসনের সংখ্যা কমে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ। ৪ জুলাইয়ের এই বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করে মূলত জেড্ডা-হায়দরাবাদ-মুম্বাই-কোচিনের যাত্রীরা কংগ্রেস বিধায়ক আমিন প্যাটেলের হস্তক্ষেপ দাবি করেন। প্যাটেল অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহণ ও সংখ্যালঘু সংক্রান্ত দপ্তরকে ১০ সেপ্টেম্বর অবধি এই সিদ্ধান্ত রদ করার জন্য দাবি জানান। ‘জম জমের’ এই পবিত্র জল খেলে শিশু থেকে প্রাপ্তবয়স্কদের নানা রোগের নিরাময় হয় বলে মুসলমানদের বিশ্বাস। এই কারণে প্রত্যেক হাজির জল নিয়ে আসার অধিকার আছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র এই মর্মে মুখ খুলতে না চাইলেও সংস্থার নির্ভরযোগ্য সূত্র এই বিজ্ঞপ্তির সভ্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন।

খবরটি ইতিমধ্যে ভাইরালও হয়ে গিয়েছে। এই সূত্রে ভারতের হজ কমিটির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এম এ খানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি হুমকি দিয়ে বলেন এয়ার ইন্ডিয়াকে ৫ লিটারের একটি পাত্রে পবিত্র ‘জম জম’-এর জল ফিরতি হজযাত্রীদের আনতে দিতেই হবে। এয়ার ইন্ডিয়ার বক্তব্য উড়িয়ে দিয়ে তিনি এই প্রসঙ্গে হজ কমিটি ও বিমান সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত MOU-এর উল্লেখ করেন।

মতামত

তৃণমূলনেত্রীর বাম-কংগ্রেস প্রশস্তি

ধীরেন দেবনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘গুপ্তধন’ গল্পের এক স্থানে লিখেছেন, “পায়ে ধরে সাধা। রা নাহি দেয় রাধা।।”— একথা এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বহুলাংশে সত্যি। নেত্রী সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভায় রাজ্যপালের প্রদত্ত ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন বিতর্কে অংশ নিয়ে বিরোধীদলনেতা কংগ্রেসের আবদুল মান্নান ও বাম পরিষদীয় দল নেতা সুজন চক্রবর্তীর উদ্দেশে যা বলেছেন তার মর্মার্থ এরূপ,— সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসের বহু আসন কেড়ে নিয়েছে। আর বাম-কংগ্রেস হয়ে গেছে অপ্রাসঙ্গিক। তাই বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধীদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। এমনকী, বাম-কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ রাজনৈতিক লড়াই, আন্দোলনেও তাঁর আপত্তি নেই। কারণ বিজেপিকে রুখতে বাম-কংগ্রেসকে তিনি অচ্ছুত মনে করেন না।

বাম-কংগ্রেস অবশ্য তৃণমূলনেত্রীর ‘তোতাবুলি’কে তীব্রভাবে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি। মান্নান ও সুজন উভয়েই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের জন্যই এরাজ্যে আজ বিজেপির বাড়-বৃদ্ধি। এজন্য দায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। তাই মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া উচিত। তৃণমূলের সঙ্গে জোটের কোনো প্রশ্নই নেই। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য এক ধাপ উঠে বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের যেসব এম এল এ-কে ভাঙিয়ে নিয়েছে, আগে তাঁদের ফিরিয়ে দিক। তারপর ভেবে দেখা যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বাম-কংগ্রেসকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, ২৩টি দল লোকসভা নির্বাচনে জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছে। ১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বামেরা তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে ধরেছিল কংগ্রেসের হাত। এরাজ্যে কংগ্রেস লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিরোধিতা করলেও দিল্লিতে তাঁর দল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছে। তিনি এদিন বামেদেরও প্রশস্তি গেয়েছেন। অতঃপর তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে বলেন, বিজেপি বাঙ্গালি-অবাঙ্গালিদের মধ্যে বিভেদ ঘটাচ্ছে। দল ভাঙাচ্ছে, ভোটে দেদার টাকা উড়িয়েছে, ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটাচ্ছে, সংবিধান বদলের চেষ্টা চলছে, কেন্দ্রের সরকার এ রাজ্যের প্রতি দুয়োরানির ন্যায় ব্যবহার করছে ইত্যাদি।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অতি বাম-কংগ্রেস প্রশস্তিতেও চিঁড়ে ভেজেনি। কারণ ১১ সালে

তৃণমূল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মাধ্যমে বাম-রাজত্বকে হটিয়ে এরাজ্যে হয়েছে ক্ষমতাসীন। অতঃপর এরাজ্যে মমতা-সরকার বিরোধীদের উপর চালিয়েছে রাজনৈতিক ‘বুলডোজার’। বিরোধীদলের বহু নেতা-কর্মী হয়েছেন রাজনৈতিক হিংসার শিকার। অগণিত হয়েছেন খুন, মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে অনেককেই পাঠানো হয়েছে জেলে। কাউকে কাউকে ভয় দেখিয়ে টানা হয়েছে শাসকদলে। নেতা-মন্ত্রী হয়েছেন কেউ কেউ। আবার দুর্নীতিবাজ-সমাজবিরোধীরা দলে দলে ঢুকেছে পিঠ বাঁচাতে ওই দলে। দিল্লি বিরোধী বামেদের ন্যায় তৃণমূল-সরকারও কেন্দ্রের আর্থিক বঞ্চনার ধুয়ো তুলে উন্নয়নখাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা স্বঘোষিত প্রকল্পের নামে করেছে নয়ছয়। সেসব প্রকল্পের সুবিধা আমজনতার কাছে পৌঁছয়নি। শাসকদলের কারু কারু কাছে কিছু পৌঁছলেও সেখানেও ছিল কাটমানি। এছাড়াও বালি-কয়লা-পাথর খাদান থেকে অবৈধ উত্তোলন, গোরু ও নারী পাচার, জমি দখল, আবাসন ও ছোটো কারখানা নির্মাতা, ভেড়ির মালিক, ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তোলা, ঘুষ বামাসোহারা আদায় চলছে সরকারের ‘কেষ্টবিষ্টু’দের মদতে। তৃণমূল নেত্রীর এসব অজানা নয়। আর তাই তো তিনি অনুগত ভাইদের উদ্দেশে বলেছেন--- তোলাবজি-কাটমানির ৭৫ শতাংশ দলকে দিতে। আর এঘটনা থেকেই প্রমাণিত, তৃণমূল-সরকার তোলাবাজ- ঘুষখোরদের সরকার। এমনকী, রাজ্য সরকারের দেওয়া সরকারি অর্থও জনগণ পুরোটা পায়নি। সেখানেও ছিল কাটমানি। এছাড়াও প্রতিটি নির্বাচনে কারচুপি, ভোট ডাকাতি, খুনোখুনি, রাহাজানি, বঞ্চনা ইত্যাদি কারণে জনমনে সৃষ্ট পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণার প্রতিফলন ঘটেছে এবার ভোট বাক্সে। নেত্রীর ৪২-এ ৪২ পাওয়ার স্বপ্ন হয়েছে ভঙ্গ ও চূর্ণ। ঝোলায় পড়েছে মাত্র ২২। আর বিজেপি ২ থেকে ১৮ হয়ে নেত্রীর ঘাড়ে ফেলছে নিঃশ্বাস। সে এখন তৃণমূলের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক। আবার ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা’ দিয়ে দলের নেতা-কর্মী- সমর্থক মায় ‘ভোটব্যাঙ্ক’ সংখ্যালঘুরা দলে দলে প্রতিদিন নাম লেখাচ্ছে বিজেপি-তে। ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছেন দলের কিছু এম এল এ। পা বাড়িয়ে আছেন আরও অনেক এম এল এ, এমপি ও মন্ত্রী। বাম ও কংগ্রেস দলেরও বহু নেতা-কর্মী-সমর্থক হাতে তুলে নিচ্ছেন বিজেপির ঝান্ডা। এঁরা সবাই করছেন ছেড়ে আসা দলের নিন্দা-মন্দ ও মুণ্ডুপাত এবং বিজেপি তথা নরেন্দ্র মোদীর উচ্ছসিত প্রশংসা।

এমতাবস্থায়, ভীত-সন্ত্রস্ত তৃণমূলনেত্রী বিজেপিকে রুখতে বিধানসভায় রাজনৈতিক শত্রু বাম-কংগ্রেসের প্রশস্তি গেয়েছেন। সেধেছেন তাদের যৌথ লড়াইয়ে শামিল হতে। কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয়নি। কারণ তৃণমূলের নির্যাতন, আগ্রাসন ও বিশ্বাসঘাতকতা তারা তোলেনি। তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেস এখন ডুবন্ত জাহাজ। তাই তাতে কেউ চড়তে চাইছে না সলিল সমাধির ভয়ে। ■

সাপ্তাহিক রাশিফল

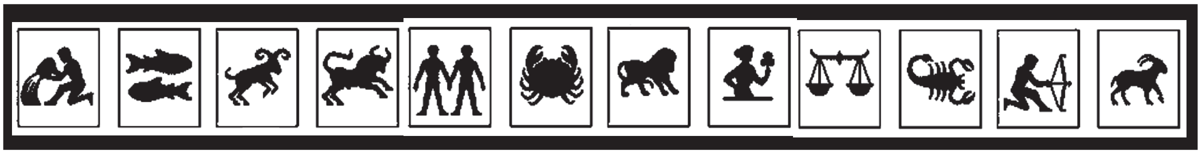

১৫ জুলাই (সোমবার) থেকে ২১ জুলাই (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রবি-রাহু-শুক্র, কর্কটে মঙ্গল-বক্রী বুধ, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি। ধনুতে বক্রী শনি-কেতু। ১৭ জুলাই বুধবার ভোর ৪টে ২ মিনিটে রবির কর্কটে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র ধনুতে মূলা নক্ষত্র থেকে কুম্ভে শতভিষা নক্ষত্রে।

মেষ : জনহিতকর কর্মের দ্বারা যশ-প্রতিপত্তি, বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তায় নতুন কর্মসংস্থানের যোগ। নৃত্য-গীত, চারুকলায় দক্ষতা বাড়তি উপার্জনের দ্বার উন্মুক্ত করবে। গৃহ সংস্কার, নতুন নির্মাণ ও বাহন ক্রয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। প্রেম-প্রীতিতে নৈরাজ্যের হতাশার দিনলিপি। গৃহিণীর চলাফেরায় সতর্ক থাকা দরকার।

বৃষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা, নিজ দক্ষতায় কর্তৃপক্ষের শংসা ও নিষ্ঠার স্বীকৃতি। তবে শারীরিক কারণে শুভ যোগাযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বিদ্যার্থী, গবেষক, সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ্, অর্থনীতি ও আইন বিশেষজ্ঞদের প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশ। বিত্ত-শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রাপ্তি। নিকটজনের বিবাহ স্থিরীকরণ ও কর্মসূত্রে দূর ভ্রমণের যোগ।

মিথুন : ছিদ্রান্বেষী, ঈর্ষাকাতর মিত্রের কারণে উদ্বেগ, জটিলতা এবং প্রিয়জনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত। পিতার পরামর্শ ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ও স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা সাংসারিক সমৃদ্ধির সহায়ক। সপ্তাহের আদ্যভাগে জ্ঞান-পাণ্ডিত্য অভিজ্ঞতায় সৃষ্টিশীল কাজের স্বীকৃতি, ঋণমুক্তি, ভ্রাতা-ভগ্নীর কর্ম পরিকল্পনার আঁধারে নতুন আলোকবর্তিকা।

কর্কট : উদ্যমের অভাব ও ভাবপ্রবণতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া ও ঋণ বৃদ্ধির যোগ। বহু শ্রম নিষ্ঠা সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা। সন্তানসন্ততির বিদ্যা, জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে সাফল্যের বারিধারা বর্ষণ। সপ্তাহের শেষভাগে ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বলতায় ব্যবসায় বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। শিল্পী-কলাকুশলীদের সৃজনী শক্তির বিকাশ, মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শংসা ও মান্যতা প্রাপ্তি। প্রেম-প্রণয় পত্নীরূপের সার্থক প্রকাশ।

সিংহ : ব্যক্তিত্ব, দৃঢ়তা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, পরাক্রম, উপহার, অলংকার, গৃহ ও মাতৃসুখ, পুত্রের সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা। সাহিত্য পিপাসুদের প্রতিভার নব উন্মেষ। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ জটিলতা ও সন্তানের বদ মেজাজ ও আইন বহির্ভূত কাজের কারণে পারিবারিক অস্থির পরিবেশ। পরিবহণ, খনিজ, তরল ও খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসায় প্রাপ্তি ক্ষেত্রে শুভ। বিতর্কিত প্রেম সম্পর্ক পরিহার করুন।

কন্যা : কাব্য, শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্মবেত্তা, বিচারক, সার্ভেয়ার, চাটার্ড,গণিতজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের চিন্তার স্বচ্ছতা প্রতিভার ব্যাপ্তি, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও একাধিক পন্থায় অর্থাগমের ক্ষেত্রে প্রশস্ত। অপ্রিয় সত্যকথনে নিকটজনের বিরাগভাজন। পিছিয়ে পড়া শ্রেণী ও বন্ধুর সহায়তায় আনন্দ। তবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে ভ্রাতৃবিরোধে মানসিক ক্লেশ।

তুলা : ষড়যন্ত্রকারীদের অপচেষ্টা ও উপার্জনে বাঁকা পথের হাতছানি, বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলে প্রতিহত করুন। কর্মক্ষেত্রে নিজ প্রভাব ও নিষ্ঠার দ্বারা সাফল্য এবং আর্থিক প্রাপ্তির ভাণ্ডার আশাপ্রদ নয়। বাড়ির শুভ অনুষ্ঠান ও সন্তানের কৃতিত্বে ও পরিজন সমাগমে আনন্দ। বিদ্যার্থীদের অনুকূল সপ্তাহ।

বৃশ্চিক : বস্ত্র, অলংকার, বাহন, পুত্র, পরিজন-সহ সুখীজীবন লাভ। দরদিমন, শিল্প ও সৌন্দর্যের পূজারি, দুর্বল শ্রেণীর সহায়তা, পেশাদারিত্বে নতুন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ ও উপার্জনের বিকল্প পথের সন্ধান। চলমান সপ্তাহে আর্থিক বিষয় আশাপ্রদ হলেও গৃহকর্তা ও গৃহিণী উভয়েরই শারীরিক ক্লেশ ও ধৈর্যচ্যুতি। বিনিয়োগ বর্জনীয়, ভ্রমণ বাতিলে ভারাক্রান্ত মন।

ধনু : প্রত্যয়ী, যুক্তিনিষ্ঠ, অনুভবী, বাস্তববুদ্ধি ও আপোশহীন মানসিকতায় সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতা ও পারিবারিক প্রতিকূল পরিবেশের অবসান। স্বজন সম্পর্কে উন্নতি। ক্রীড়াবিদ, কুস্তিগির, শল্যচিকিৎসক, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পুলিশ, মিলিটারি, হার্ডওয়ার, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে নিযুক্তদের কারিগরি কুশলতা, বিত্ত ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাতে সতর্কতা।

মকর : ন্যায়, সততা, দর্শন, মননশীলতা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা ও বাক্‌চাতুর্যে নতুন উদ্যোগ। কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন যোগাযোগ ও কর্মপ্রার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠার বাস্তবায়ন। অসৎ সংসর্গে সন্তানের চালচলনে নৈরাজ্যের দিনলিপি, অধ্যয়নে মনঃসংযোগের অভাব ও কৌশলী মনোভাব। হৃদযন্ত্র ও বদহজম জনিত ক্লেশ।

কুম্ভ : জীবনসঙ্গীর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্তব্যপরায়ণতায় স্বজন সম্পর্কে উন্নতি। পেশাগত সাফল্য, সম্মান, সৌভাগ্যের নতুন দিশায় কর্তৃপক্ষের শুভ দৃষ্টি। স্বর্ণালংকার, ঔষুধ, বস্ত্র ও শৌখিন ব্যবসায় আর্থিক সজীবতা প্রাপ্তি। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা দুরূহ ও ভ্রমণকালে মনঃক্লেশ।

মীন : কর্মক্ষেত্রে চাপ, ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিষ্ঠা, দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনায়াস সাফল্য করায়ত্ত। নিজের স্পষ্টবাদিতায় জনপ্রিয়তা, সন্তানের প্রতিষ্ঠায় মানসিক প্রশান্তি। সপ্তাহের প্রান্তভাগে অনিয়ম ও রমণীর কুহকে সুন্দর ও বর্ণময় জীবনে ছন্দপতন। বিদ্যার্থী ও কৃষিজীবীদের অনুকূল সপ্তাহ।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য